মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৯ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
খালেদ চৌধুরী
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৫ কৈলাস মুখার্জি লেন
কলকাতা-৬।

শ্রীবুদ্ধদেব গুহ

কল্যাণীয়েষু

# এই যুবকেরা

মৃগেন সাইকেলের চেন ঠিক করে নিচ্ছিল। পায়ের শব্দে ঘাড় ঘোরাল। দিদি। কাছেই কোথাও গিয়েছিল ; ফিরল।

"কোথায় যাচ্ছিস ?" কেতকী বলল।

"শতোর বাড়ি।"

"ওর বাড়িতে গিয়ে কী করিস তোরা ? রোজই শুনি শতোর বাড়ি।"

মৃগেন ভেবেছিল কোনো জবাব দেবে না। দেবার দরকার নেই। কী মনে করে বলল, "দরকার আছে।"

কেতকী খুশী হল না। বিরক্তির মুখ করে পাশ কাটাল মৃগেনের। সদরে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ল।

মৃগেন বলল, "খোলা আছে।"

কেতকী নজর করে নি, করলে দেখতে পেত দরজা ভেজানো রয়েছে। ভেতরে গেল কেতকী। সদর বন্ধ করল।

মৃগেন আর দাঁড়াল না।

শীত ফুরিয়ে গিয়েছে, তবু সকালের দিকে হালকা ঠাণ্ডা বোঝা যায়। বিশেষ করে এই জায়গাটায়। সামনে এক মস্ত পুকুর, ঝিলের মতন। লোকে বলে লোকো ট্যাংক। কোনো কালে হয়ত এদিকে রেলের লোকো শেড্ ছিল, এখন নেই। ভাঙা চোরা লোহা-লক্কড়, টিন, দু'চারটে গাড়ির চাকা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে এই যা। ঝিলের ওপারে রেল লাইন। এ-পারে রেলের কোয়ার্টারস। চতুর্দিকে উঁচু-নীচু মাঠ, মাঠ ভরতি আগাছা আর ঝোপ। পেছনে, অনেকটা তফাতে, পাহাড়ের মতন এক টিলা দাঁড়িয়ে আছে।

মৃগেন একবার আকাশটা দেখে নিল। তকতকে আকাশ, চমৎকার রোদ। কাল বিকেলে মেঘলা মতন হয়েছিল। আজ আর মেঘ নেই।

মোরনের সরু সরু রাস্তা। এখনও ভাল করে রাস্তা তৈরি হয় নি। কোয়া-র্টারও হয়ে ওঠে নি সব। কাজ চলছে। রাশি রাশি ইঁট, লোহা পড়ে রয়েছে

এখানে ওখানে। মিস্ত্রী মজুরের এক বড় ছাউনি ওদিকটায়।

মৃগেন খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। আবার চেন খুলল। আজ ক'দিনই এই রকম হচ্ছে। আধ মাইল রাস্তা যেতে পাঁচবার চেন খুলে যায়। চেনটা পালটাতে হবে। টাকা-পয়সা থাকলে মৃগেন পুরো সাইকেলটাই পালটে ফেলত। এই সাইকেলের হাল আর মৃগেনের হাল একই রকম। সবই অকেজো হয়ে গিয়েছে। হ্যাণ্ডেল, প্যাডেল, চাকা—কোনোটাই আর ঠিক-ঠাক নেই, নেহাত চাকা দুটো ঘোরে তাই চলে যাচ্ছে।

চেন লাগিয়ে মৃগেন আবার এগুতে লাগল। শতোদের বাড়ি কম করেও দেড় মাইল রাস্তা। এই নিউ কোয়ার্টারসে এসে সুবিধের মধ্যে মৃগেনকে এ-বেলা ও-বেলা মাইল সাত আট সাইকেল ঠেঙাতে হয়। কপাল। দিদি চাকরি করে, কোয়ার্টার তার, অনেক কাটখড় পুড়িয়ে তবে এমন নতুন ঝকঝকে কোয়ার্টার পেয়েছে! তুমি কি চাকরি করো, না তোমার মুরোদ আছে শহরে বাড়ি ভাড়া করে থাকার? দিদির দয়ায় খাচ্ছ পরছো—তার আবার কথা।

না, মৃগেনের কিছু বলার নেই। বরং সে হাজার বার বলবে, দিদি তাদের বাঁচিয়েছে। আগে যেভাবে ছিল, যেখানে ছিল—সে তো এক নরক। চার শরিকের বাড়ি, বিশ পঁচিশজন মানুষ নানা ধরনের, বুড়োবুড়ি, ছেলে বউ, বাচ্চা কাচ্চা, এ চেঁচায়, ও কাঁদে, তার বউ হাসপাতালে যায়, আঁতুড়ে কার বাচ্চা মরে, তার ওপর চব্বিশঘণ্টা ঝগড়া, বউয়ে বউয়ে লড়াই। বড় বউদি একদিন হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে এমনই ঝগড়া করছিল মেজো বউদির সঙ্গে যে তার খেয়ালই ছিল না আশেপাশে লোকজন হেসে মরছে। এই নরক থেকে মৃগেনরা মুক্তি পেয়েছে, দিদির চেষ্টায়। দিদি ও-বাড়ির কোনো কিছু আর সহ্য করতে পারছিল না। তার মাথা গরম হয়ে যেত। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠত রাগে। বলত, যতসব অসভ্য, অমানুষ, ইতরের কাণ্ড। এটা কোনো ভদ্রলোকের বাড়ি নয়।

দিদি বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় বলতই না। তার ঘেন্না করত। এমন কি ঝুনুদি, যার সঙ্গে দিদির ছেলেবেলা থেকে ভাবসাব বন্ধুত্ব

ছিল—সেই ঝুনুদি যখন অন্যদের মতন হয়ে গেল দিদি তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিল, তুই আমার কাছে আসবি না। ভাল লাগে না আমার।
ও-বাড়িতে দিদিকে সবাই ঠেস দিয়ে কথা বলত। ঠোঁট ওলটাতো। নানা রকম কথা বলাবলি করত।
মায়ের হয়েছিল মুশকিল। দু কূল রেখে মানুষ কতদিন চলবে? আত্মীয়-স্বজনকে চটাতে চাইত না, অকারণ অশান্তি করাও পছন্দ করত না। আবার দিদির মেজাজ, রাগ, ঘেন্নাকেও অবজ্ঞা করতে পারত না। অনেক সময় বলত, 'তোরা তো বুঝিস না—হাজার হলেও ওরা আমার ভাশুর, জা, ভাশুরপো, ভাশুরঝি। আত্মীয়। আমি কেমন করে ওদের কুকুর-বেড়ালের মতন দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব! মানুষ পারে?'
দিদি বলত, 'যারা কুকুর বেড়াল তাদের দূর দূর করবে না তো কি ঠাকুর-পূজো করবে?'
'অমন কথা বলিস না। তোরা চোখে দেখিস নি তাই বলছিস। এ-বাড়িতে একদিন লক্ষ্মী বাঁধা ছিল। সুখ উথলে থাকত।'
'হ্যাঁ, সবই একেবারে উথলে উঠেছিল। ওই পুরোন কাসুন্দি ঘেঁটো না। অনেক শুনেছি। এই নোওরা নচ্ছারদের সঙ্গে আমি থাকব না। তোমার মেয়েকে নিয়ে ওরা কী বলাবলি করে জানো না?'
দয়াময়ী আর কথা বাড়াবার ভরসা পেতেন না। 'থাকিস না। আমি কি বলছি থাকতে?'
'হ্যাঁ, থাকব না। কোয়ার্টার পেলেই চলে যাব।'
দিদির কথার কোনো নড়চড় নেই। কোয়ার্টার পেয়েছে কি চলে এসেছে। মাস খানেকও হয়নি পুরো এখানে। যখন এসেছিল তখনও শীতের ভাব ছিল। মাঘের হাওয়া বইত মাঠের ধুলো উড়িয়ে। এই জায়গাটা এখনও চোখে সয় নি। সবই নতুন নতুন লাগে। আকাশ, রোদ, পুকুর, রেল লাইন, ওই পাহাড়ের মতন টিলা। মায়ের প্রথম দিকে যেন খানিকটা ভয়-ভয় ভাব ছিল। এত ফাঁকায় চলে এলাম। লোকজন বড় কম। হুট করে দরকার পড়লে কিচ্ছুটি পাবার উপায় নেই, একটা ছুঁচ কিনতে মাইলটাক ছোট।

'আর তোরও তো কতখানি আসা-যাওয়া। স্টেশন কি কাছে?'

দিদির কোনো ভয়-ভাবনা নেই। সে খুশী। যত রাজ্যের ইতর, অসভ্য, অভব্য মানুষদের দলে বছরের পর বছর কেটেছে। বাড়ি ভরতি ময়লা, দুর্গন্ধ। এক একটা কলঘরে চারবেলা বারো চোদ্দজন ঢুকছে বেরুচ্ছে। উঠোন ভরতি ময়লা ভিজে কাপড়ের মেলা। কাঁথা শুকোচ্ছে সারা দিন। ঘরের জানলা খুললে বড় তরফের বড়বাবুর ইট সুরকির গুদোম। নালার দুর্গন্ধ ছাড়া কোনো গন্ধ আসে না ঘরে। বাতাস নেই।

এখানে নেই কী? এমন খোলামেলা, ছিমছাম জায়গা। মাথার ওপর কত বড় আকাশ, সকালে কত রোদ নামে দেখেছ? মাঠের ঘাসে কাঁটাফুল। ওই ঝিলের মতন পুকুরটায় যত জল, তত শ্যাওলা আর জল-পাতা। কেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি রেলগাড়ি দেখছ? এখানে দুর্গন্ধ নেই, কোন্দল নেই, চেঁচামেচি নেই। অল্প কিছু রেল কোয়ার্টার, মাথা গুণতি মানুষ। আমার একটু অসুবিধে হয় ঠিকই, খানিকটা হেঁটে গিয়ে তবে রিকশা পাই। তাতে আর কী? আজ একটা বছর যাক, দেখো না—এখানেই রিকশা বাজার সব পাবে।

দিদি এখানে এসে পর্যন্ত একটু ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছে। রোজই ঘর গুছোচ্ছে। তাদের কিছু আসবাবপত্র পুরনো বাড়িতে ছিল। পৈতৃক। খাট, আলমারি, দেরাজ, আয়না—টুকিটাকি আরও কত রকম। দিদি একটা কাঠও ফেলে আসেনি। কিচ্ছু ফেলে যাব না, একটা পিঁড়ে পর্যন্ত নয়, তুমি সব নিয়ে যাবে মা।

মৃগেনকেই পুরো ঝামেলা সামলাতে হয়েছে। লরির ব্যবস্থা করো, মাল তোল, কোয়ার্টারে গিয়ে মাল নামাও। দুটো দিন কম খাটুনি গিয়েছে মৃগেনের। ঘাড় পিঠ ব্যথা হয়ে গিয়েছিল।

এখন মৃগেন ঝাড়া হাত-পা। বাজারহাট করে দেওয়া ছাড়া তার কোনো ঝামেলা নেই। বাকি সব মা আর দিদি। মা সংসার সামলাচ্ছে, আর দিদি অফিস থেকে ফিরে এসে এটা ওটা টানছে, সরাচ্ছে, জানলার পরদা তৈরি করছে, যতটা পারছে ছিমছাম করছে ঘরবাড়ি।

কোয়ার্টারে রান্না ভাঁড়ার বাদ দিলে আড়াই খানা ঘর, ভেতরে ঢাকা বারান্দা আর চাতাল। পেছনে এক ফালি চাতাল—দাঁড়াবার বসবার; রেলিং দিয়ে ঘেরা।

দিদির শখ বাগান করবে পেছনে। এই মাসটা যাক। একটু রয়ে সয়ে করবে।

মৃগেন বলেছিল, 'গরম পড়ে আসবে। বাগান গরমে করে না। বর্ষায় করে।'

কেতকী হেসে ফেলেছিল। 'তুই শীত না যেতেই গরম দেখছিস। বসন্ত রয়েছে না। বসন্তকালে বাগান হয় না। কোথাকার পণ্ডিত তুই ?'

মৃগেন আর কথা বলে নি। বেশ তো দিদি বসন্তেই বাগান করুক।

স্টেশনের কাছাকাছি আসতেই মৃগেন বাবুয়াকে দেখতে পেল। বাবুয়া পড়িমড়ি ছুটছে।

মৃগেন ডাকল, "এই।"

বাবুয়া ছুটতে ছুটতে পেছন ফিরে তাকাল। "ট্রেন এসে পড়ল।"

"আয়, নামিয়ে দেব।"

সামান্য রাস্তা। তবু সাইকেলে সময় বাঁচবে। বাবুয়া এসে সামনে রডের ওপর বসল।

মৃগেন বলল, "কোথায় ট্রেন ?"

"সিগন্যাল হয়ে গিয়েছে।"

সামান্য কুঁজো হয়ে মৃগেন জোর বাড়াল সাইকেলের। "তোর এখন সকালের শিফট ?"

"আজকেই শুরু হল।...সকালে শালা ঘুমই ভাঙতে চায় না, তার ওপর চান করো, খাও, ছোটো— ; সময়ই পাওয়া যায় না।"

মৃগেন ঠাট্টার গলায় বলল, "চাকরি করছ ভাই, একটু কষ্ট তো সইতেই হবে।"

"চাকরি না ইয়ে। কারখানার সিকিউরিটি কী জিনিস জানো না, শালা।

যত্ত ছোটলোকের কাজ। ছেড়ে দেব।”

“দাও, আর পাবে না।”

বাবুয়া সেটা জানে। মুখে বলল, এইমাত্র। দেড় বছর এর ওর পায়ে ধরে তার বাবা এই কাজটা জুটিয়ে দিয়েছে। মাইল চারেক দূরে কারখানা। ট্রেনে করে আসা-যাওয়া করতে হয়।

“তুই কোথায় যাচ্ছিস?” বাবুয়া জিজ্ঞেস করল।

“শতোর বাড়ি।”

“অনেকদিন যাইনি।”

“আজ আয় না সন্ধেবেলা।”

“দেখি।”

মৃগেন কিছু বোঝবার আগেই তার সাইকেলের চেন ছিঁড়ে গেল। মুখে একটা ‘যাঃ’ শব্দ করল।

বাবুয়া নেমে পড়ল। “কিরে?”

“চেন কেটে গেল।”

“নে এবার ঠেলা সামলা। আমি চলি রে। লাইন টপকাব।”

বাবুয়া ছুটতে লাগল।

মৃগেন বুঝল আর তার কিছু করার নেই। চেন কেটে গিয়েছে। সাইকেল ঠেলে বাজারে যেতে হবে। চেনটা যদি মেরামত করা যায় ভাল, না হলে সাইকেল ফেলে রেখে আসতে হবে।

বাজারে তার সেজজেঠার সাইকেলের দোকান ‘নিউ সাইকেল স্টোর্স’। জেঠা আর কড়িবাবু দুই পার্টনার। নতুন সাইকেল বিক্রি হয়, মেরামতিও হয়। সেজজেঠার দোকানে তার যাবার উপায় নেই। জেঠা হাসবে। আবার দিদি জানতে পারলে রক্ষে রাখবে না। তার চেয়ে ভরতই ভাল। হাতে পায়ে ধরলে ব্যবস্থা একটা করে দেবে যা হোক।

সাইকেলের চেন হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে মৃগেন ওভারব্রিজে উঠতে লাগল। ততক্ষণে সকালের প্যাসেঞ্জার এসে গেল।

ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে যেতে যেতে মৃগেন একবার নীচে প্লাটফর্মের

দিকে তাকাল। দেদার লোক, হল্লা, ছোটাছুটি। কতকগুলো কাক প্লাট-ফর্মের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে। কলের জলের কাছে ভিড়।

দিদির অফিস এই স্টেশনেই। একেবারে শেষের ঘরটা। দিদি মেয়ে টি. সি.। আরও একজন আছে, ঊষাদি। দিদিরও দুরকম ডিউটি। এখন বিকেল ডিউটি চলছে। দুটো থেকে ডিউটি। রাত পর্যন্ত।

ওভারব্রিজ থেকে নামছিল মৃগেন, হঠাৎ পদ্মাকে দেখল।

পদ্মাও তাকে দেখেছে।

দুজনে চোখাচোখি হল। কথা বলল না পদ্মা। যেন দেখেও দেখল না। হন্তদন্ত ভাব। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি উঠতে লাগল।

মৃগেনই জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছিস ?"

পদ্মা পেছন ফিরে তাকাল না ; কোনো জবাবও দিল না।

মৃগেন অবাক হল। পদ্মা তার জেঠতুতো বোন। একটা কথাও বলল না। অদ্ভুত। দিদি ঠিকই বলে, ওরা—ও-বাড়ির লোকেরা বড় অসভ্য। একটা কথা বললে মহাভারত কি অশুদ্ধ হত !

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মৃগেনের। একে সাইকেলের চেন, তার ওপর এই অপমান। ঠিক আছে, মৃগেনও মনে রাখবে। এক মাঘে শীত যায় না। সীতুকেই ঘুরিয়ে বলবে মৃগেন একদিন। সীতুর সঙ্গে পদ্মার একটা চুপিচুপি ব্যাপার চলছে। মৃগেন এবং তার বন্ধুরা সবাই জানে।

ওভারব্রিজ থেকে নেমে খানিকটা এগিয়ে মৃগেন হঠাৎ দাঁড়াল। আচ্ছা, পদ্মা কোথায় গেল ? ও তো ট্রেন ধরতে যাবে না। তা হলে ? এই সকালের দিকে তার যাবার জায়গা কোথায় ? মৃগেন ভাবল। কিছুই বুঝতে পারল না।

যাক যেখানে খুশি। মৃগেনের কী ?

শতদল তার ঘরেই ছিল। জোছন ক'টা ফটোর প্রিন্ট দেখাচ্ছিল শতদলকে।

"এই তোর আটটা সাড়ে আটটা ?" শতদল বলল।

"সাইকেলের চেন ছিঁড়ে গেল, কী করব !"

“ওটা ফেলে দে বেটা, বিদেয় কর। আজ পাঞ্চার, কাল টায়ার ফেটেছে, পরশু সীট খুলে গেল। তুই পায়ে হাঁটা প্র্যাকটিস কর।”

“তাই করব,” মৃগেন হাসল। “কিসের ফটো দেখছিস?”

“পিকনিকের। দারুণ তুলেছে জোছন।”

মৃগেন বুঝতে পারল। প্রত্যেক বছর শীতে বন্ধুরা মিলে পিকনিকে যায়। এবারও গিয়েছিল। মৃগেন যেতে পারে নি, তার জ্বরজ্বালা চলছিল।

জোছন বলল, “ফুলটুস বলছিল নেগেটিভ হারিয়ে ফেলেছে। আমিও ছেড়ে দেবার ছেলে নই। এক মাস পরে উদ্ধার করলাম। নে দেখ।”

জোছন ছবিগুলো দেখতে দিল মৃগেনকে।

মৃগেন ছবি দেখছিল। শতদল, জোছন, মানিক, বাবুয়া, সীতু, নীলেন্দু। সবাই রয়েছে। বেশ ভাল জায়গাতেই গিয়েছিল, ঝুমুয়া মাইনসের কাছে। গাছপালা, ফুল, বরাকর নদীর একটা বাঁক বুঝি ওখানে, বড় বড় পাথর দেখা যাচ্ছিল।

ফটোগুলো ফেরত দিল মৃগেন। “ভাল হয়েছে রে!”

“তুই মিস করলি,” জোছন বলল।

কী ভেবে মৃগেন বলল, “আমি সব তাতেই মিস।”

“সত্যি,” শতদল বলল, “তুই অ্যায়সা ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে চলে গেলি মৃগু, তোকে আর রোজ পাওয়াই যাবে না।

জোছন পকেট থেকে সিগারেট বার করল। শতদলকে বলল, “কেউ আসবে নাকি রে?”

মাথা নাড়ল শতদল। না।

সিগারেট ধরাল তিন বন্ধু। তারপর শতদল বলল, “তুই এত দেরি করলি মৃগু, এখন গিয়ে কি দেখা পাব? ক'টা বাজল?”

“সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে,” জোছন ঘড়ি দেখল হাতের। “যাবি কোথায়?”

“রাজেনবাবুর কাছে।”

“রাজু ভৌমিক! চোরের উকিল!”

“তোর কোনো সেন্স নেই জোছন, অনেক জিনিসের জাত থাকে না।

উকিল ইজ উকিল। চোরেরও উকিল, সাধুরও কিউল্ল। আমাদের কী! আমরা যাব আমাদের কাজে," শতদল বলল।

"কাজটা কী?" জোছন জিজ্ঞেস করল।

"মিউনিসিপ্যালিটি একজন ক্লার্ক নেবে। রাজেনবাবুর কথাই সব। মৃগুর জন্যে ধরব।"

জোছন জোরে হেসে উঠল। যেন কত মজার কথা শুনেছে।

"হাসছিস?" শতদল বলল।

জোছন বলল, "রাজু ভৌমিক চাকরি দেবে মল্লিকবাড়ির ছেলেকে। যা গিয়ে দেখ না!"

"কেন?" শতদল বলল, "মল্লিকবাড়ি তার কী করেছে?"

জোছন নিজেই কেমন অবাক হয়ে বলল, "তোরা সব ভুলে যাস। শর্ট মেমারি। এই তো সেদিন বিষ্টুদা ওকে কী করেছিল মনে নেই?"

শতদল এবং মৃগেন দুজনেরই মনে পড়ল। জোছন বলল, 'সেদিন'—; আসলে বছর দেড়েক আগের ঘটনা। মিউনিসিপ্যাল মাঠে রাজুবাবুরা একটা 'বেবি শো' করেছিল। নামে 'বেবি' আসলে শো। দিন তিনেক ধরে অনেক হই হই হল। মাইক বাজল, বেলুন উড়ল, সাজগোজ করা বাচ্চারা এল ভাল বাড়ি থেকে, আলোর রোশনাই ছুটল, স্লাইড শো, সিনেমা—এমন কি একদিন গান-বাজনাও হল। ঠিক তখন শহরের অন্য-দিকে বসন্ত লেগে গিয়েছে। প্রায় মড়কের মতন। কুলি মজুরের মহল্লা সেটা। বিষ্ণু তার চেলাদের জুটিয়ে এনে 'বেবি শো'-র ওপর হামলা করল। নাস্তানাবুদ করল রাজেনবাবুদের। রাজেনবাবু অপমানের একশেষ হয়েছিলেন।

ব্যাপারটা পুরনো। তা ছাড়া মৃগেনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বিষ্ণু মৃগেনের বড় জেঠার মেজো ছেলে, জেঠতুতো ভাই—এইমাত্র সম্পর্ক। এটা ঠিক, বিষ্ণু এই শহরের একজন মার্কামারা ছেলে। তার দলবল আছে, সে নানান কীর্তি করে বেড়ায়। কিন্তু এমন কিছু করে নি যে তার নামে আতঙ্ক হবে।

মৃগেন বলল, "বিষ্টুদা করেছে তো আমি কী করব ?"
জোছন বলল, "যাঁহা বিষ্টু তাঁহা ব্রহ্মা। একই ফ্যামিলি।" বলে হাসল।
শতদল বলল, "তুই আগে থেকেই টুকছিস। একবার যেতে দোষ কী!"
"না দোষের কিছু নেই, যা গিয়ে দেখ।…তবে আজ আর তাকে পাবি কোথায়! দশটা বাজতে চলল।"
"আজ হবে না আর। কাল।…মৃগু, তুই যদি সকাল সকাল না আসিস, হবে না।"
জোছন উঠে পড়ল। বলল, "আমি চলি রে! সন্ধেবেলা দেখা হবে।"
চলে গেল জোছন। সে বেশ মজার চাকরি করে। ম্যালেরিয়া কনট্রোল অফিসে। দশটা বারোটা যে-কোনো সময় একবার গেলেই হল।
শতদল হাই তুলল। আড়মোড় ভাঙল। বলল, "চা খাবি না ?"
মাথা হেলাল শতদল। খাবে।
"দাঁড়া বলে আসি।"
"বাড়িতে কেন, দোকানে চল।"
"দোকানে? দাঁড়া তা হলে একটু বাথরুম ঘুরে আসছি।"
শতদল ভেতরে চলে গেল।
মৃগেন বসে বসে শতদলের ঘর দেখতে লাগল। অন্যমনস্কভাবেই। নতুন করে দেখার কিছু নেই। নিত্যকার চেনা ঘর। জানলা দরজা খাট বিছানা টেবিল কাঠের আলমারি। তবু এরই মধ্যে শতদলের পারিবারিক সচ্ছলতা ধরা যায়। শতদলের বাবা ডাক্তার। ভাল ডাক্তার। পশার আছে। বাজারের কাছে ডিসপেনসারি। শীতলকাকার টাকার খাঁই নেই, মানুষটিও ভাল, কিন্তু কেমন যেন খেপাটে। খেয়াল হলে রোগীর বাড়ি গিয়ে বসে থাকবেন দু ঘণ্টা, আবার মেজাজ খারাপ থাকলে ডিসপেনসারি থেকে রোগী তাড়িয়ে দেবেন। এ-সবের জন্যে কিছু দুর্নামও আছে। বাড়িতে বেশ অশান্তি। কাকাবাবুর সঙ্গে কাকিমার বনে না। শতোর মা নেই। শতোর মা কাকা-বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। তিনি মারা গিয়েছেন অনেককাল, শতোর যখন চার পাঁচ বছর বয়েস। কাকাবাবু আবার বিয়ে করেন—এই কাকিমা

সেই দ্বিতীয় পক্ষের।

"এই যে!"

মৃগেন তাকাল। বাঁশরী।

"আরে, এ কী?" মৃগেন বলল অবাক হয়ে। বাঁশরীর বাঁ হাতের কব্জি পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। "কী হয়েছে?"

"হাত ভেঙেছে।" এমন করে বলল বাঁশরী যেন হাত ভাঙাটা মজার ব্যাপার।

"যাঃ!"

"একটু একটু ভেঙেছে," বাঁশরী হাসল মজার চোখ করে।

"কবে? শুনি নি তো?"

"কাল রাত্তির বেলায়। পা পিছলে পড়ে গেলাম। হাতে যা লাগল!"

"তাই বলো, চোট পেয়েছ! ভাঙেনি।"

"কেমন করে বুঝলে! বাবা ওষুধ দিল। রাত্তিতে ঘুমোতে পারলাম। এখনও বেশ ব্যথা।"

"সেরে যাবে। মচকে-টচকে গিয়েছে।"

বাঁশরী সরে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল। রোদ এসে তার পিঠে পড়ল। বেশ লাগে বাঁশরীকে দেখতে। রোগা চেহারা, ধবধবে ফরসা রঙ, লম্বা বাঁশির মত দেখতে, সামান্য ছোট ছোট চোখ, বাঁ গালে আঁচিল। চোখ আর হাসি যত মিষ্টি তত ছেলেমানুষিতে ভরা।

বাঁশরী বলল, "তুমি আমাকে সেই জিনিসটা এনে দিলে না?"

মৃগেনের মনে পড়ল। দিদির কাছে একটা রঙচঙে বিলিতি বই আছে—উল বোনার ডিজাইনের। বইটা এনে দেবে বলেছিল মৃগেন। ভুলে গিয়েছে। বলল, "দেব।...আমাদের যা হাল হয়েছে এখন। কোথায় কী আছে গরু খোঁজা করে দেখতে হবে। শীতও তো চলে গেল।"

বাঁশরী আদুরে গলা করে বলল, "আমার জন্যে একটু গরু খোঁজা করলেই বা।"

মৃগেন হেসে ফেলল। "করব।"

"তুমি যে কী মিছে কথা বলতে পার। দাদাকেও হার মানাও।"

হঠাৎ মৃগেনের কানে গেল পানু চিৎকার করতে করতে আসছে : 'শতো, শতো, শীগগির···সীতু বিষ খেয়েছে।'

ঝড়ের মতন পানু ঘরে ঢুকল। উদভ্রান্ত। হাঁফাচ্ছে। চোখমুখ লাল। দম নিতে পারছে না। কোনো রকমে বলল, "সীতু বিষ খেয়েছে। হাসপাতালে। মরে যাবে।"

মৃগেনের সর্বাঙ্গ চমকে গেল। পদ্মাকে সে দেখতে পেল নিমেষে। ওভার-ব্রিজ দিয়ে চলে যাচ্ছে। যেন ছুটছে।

সীতুর ব্যাপারটা যেমন রটেছিল তেমন নয়।

চায়ের দোকানে বসে কথা হচ্ছিল সন্ধেবেলায়। শতদল, মৃগেন, জোছন, পানু, সবাই ছিল।

শতদল বলল, "শালা আমাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিল। সবাই হাসছে।" ওর কথায় রাগ আর বিরক্তি। বেশ চটে রয়েছে।

পানু বলল, "ও সেরে উঠুক, দেখ কী করি! খচড়ার মাথা কামিয়ে রাস্তায় বার করব।"

"ঘণ্টা করবি," জোছন বলল। বলে রুক্ষ গলায় পানুকেই ধমকে উঠল, "তোকেও বলিহারি যাই। কে বলল, কাকে তোর কান নিয়ে গিয়েছে আর তুইও পোঁ পোঁ করে ছুটলি। তামাম লোক জেনে গেল সীতু বিষ খেয়েছে।"

পানু কাল থেকেই বন্ধুদের চোট খাচ্ছে। নিজেই কেমন বোকা অপ্রস্তুত হয়ে আছে। সে কেমন করে জানবে, সীতু সস্তার চোলাই খেতে গিয়ে এই কাণ্ড করেছে। যেমন শুনেছে তেমন বলেছে পানু। সীতুর বাড়ির লোকরাই মিথ্যে কথা বলেছিল।

শতদল বলল, "বললে তো শুনবে না। কতদিন বলেছি, সীতু বি কেয়ার-ফুল। তোর খুব চুকুচুকুতে মন গিয়েছে। চল্‌লুও খাচ্ছিস। একদিন মরবি। সেই মরল বেটা, আমাদেরও মেরে গেল। পাঞ্চার করে দিয়ে গেল প্রেস্টিজ।" বলে শতদল চায়ের কাপ ঠেলে দিয়ে একটা সিগারেট নিল সামনের প্যাকেট থেকে। বলল, "বাবা কাল আমায় কী বলল জানিস? বলল, কি

হে তোমারও কি ওইসব চলছে ? লজ্জায় মরে যাই মাইরি।”
পানু এবার খানিকটা তোতলানোর মতন করে বলল, “তোরা আমার দোষ দিচ্ছিস। আমি কী করব। সীতুর মা বলল, বোন বলল। কাঁদছিল। আমি কি সীতুর সঙ্গে ছিলাম ? ওর বাড়িতে যা বলেছে বিলিভ করেছি।”
“ইংরিজি ছাড়বি না, উল্লুক” জোছন তখনও খেপে আছে, “বিলিভ করেছি। বিলিভে ক'টা ‘ই' আর ‘আই' লাগে জানিস ? হনুমান কোথাকার। তুই জানিস না, সীতুর মা-বাবা কেমন লোক ! তা ছাড়া কেউ কি বলে, পানু চাঁদ আমার ছেলে কার্বাইড-চোলাই মাল খেয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে ?”
পানু এতক্ষণ সহ্য করেছিল, আর পারল না। “এটা পারসোন্যাল হচ্ছে।”
“আবার ইংরিজি ?”
“কেন, ইংরিজি কি তোর ··” পানু কোনো রকমে ‘বাপের' কথাটা সামলে নিল। জিভ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল প্রায়।
জোছন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, “ফিল আপ দি গ্যাপ্ কর—তার-পর তোকে ঝাড়ব।”
ব্যাপারটা এমন হল যে শতদল মৃগেন নীলেন্দু হো হো করে হেসে উঠল। হাসি তখনও থামেনি, মৃগেন বলল, “তোরা বড় ছেলেমানুষি করছিস। ছেড়ে দে—।”
হাসি ঠাট্টায় কাজ হল। রাগ পড়ল জোছনের। সে যে খুব বদমেজাজা তা নয়, কিন্তু কখনও কখনও চটে যায় হুট করে। সীতুর ব্যাপারে সত্যিই সে রেগে গিয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই সীতুকে তার পছন্দ হচ্ছে না।
নীলেন্দু সকলের মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে বলল, “শতো, আর-এক রাউণ্ড চা হোক।”
“পয়সা কে ছাড়ছে, তুই ?”
“অত পয়সা পয়সা করিস কেন ! তোরা বড় গরীব,” নীলেন্দু তামাশার মতন করে বলল, “পাঁচ কাপ চা দেখিয়ে আমায় ভয় পাওয়াবি ? কানু, এই কানু পাঁচটা চা লাগা, পয়লা নম্বর।”

চায়ের দোকানের কাছাকাছি টেবিলে অন্য কেউ ছিল না। খানিকটা তফাতে দু জন ছিল। তারা ব্যবসার কথাবার্তা বলছিল।

কান্নু এসে টেবিল পরিষ্কার করে গেল।

শতদল বলল, "নীলু, আজ তুই বড়লোক নাকি?"

"টিউশনির টাকা পেয়েছি।"

"তা হলে শুধু চা কেন বেটা? কিছু খাওয়া।"

"সিঙ্গাড়া খাবি তো খা। বলে দে।"

এবার জোছনই হাঁক দিয়ে সিঙ্গাড়ার কথা বলল। শ্রীপদর দোকানে এই জিনিসটা মুখরোচক।

সামান্য চুপচাপ। নীলেন্দু বলল, "দেখ, গানের টিউশানি আর আমার ভাল লাগছে না।"

"হঠাৎ?"

"হঠাৎ কেন, আগেও বলেছি, এ আমার পোষায় না।" নীলেন্দু বিরক্ত বীতস্পৃহ। "হপ্তায় তিন চার দিন ক'টা মেয়ে নিয়ে বসে 'কে এলে মোর ঘুম ঘোরে ··আর পোষায় না। থার্ড ক্লাস।"

"করিস কেন তবে?" জোছন বলল।

"পেটের দায়ে। আর কিছু জানি না বলে। অন্য কিছু জোটেনি তাই। তা বলে বলছি না—আমি গানটাও জানি! জানি না। আমি হলাম শেয়াল রাজা।"

বন্ধুরা কেমন চুপ করে গেল। দেখতে লাগল নীলেন্দুকে। রোগা পাতলা ছেলে, দু চোখেই মোটা কাচের চশমা, একমাথা চুল। প্লুরিসিতে ভুগেছে বছর দুই আগে। বাড়িতে মা আর-এক ছোট ভাই। ভাইটার পোলিও হয়েছিল। একটা পা একেবারে জখম। মা অবসর সময় সেলাইয়ের কাজ করে বাড়িতে।

শতদল কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই জোছন বলল, "তুই তো বেশ গাইতে পারিস, নীলু; গান জানিস না বলছিস কেন?"

"দূর! গান গাওয়া এক জিনিস আর জানা অন্য জিনিস। অনেক তফাত।"

মৃগেন বলল, "তোর পেট বড় না জানা বড় ?"
নীলেন্দু কোনো জবাব দিল না।
চা সিঙ্গাড়া এল।
খেতে বসে সবাই কেমন চুপচাপ। দু চারটে মামুলি কথা। কী হয়ে গেল হঠাৎ কেউ বুঝল না।
জোছনই পয়সা দিল। নীলেন্দু দিতে যাচ্ছিল। জোছন বলল, "কাল দিস। নে চল—একটু ঘুরে আসি।"
রাস্তায় নেমে পানু বলল, "আমি আর যাব না। বাড়িতে দরকার আছে।"
"যা তুই," শতদল বলল।
"কোন দিকে যাবি ?" মৃগেন জিজ্ঞাসা করল।
একটু ভেবে জোছন বলল, "ফাঁকায় চল। এ শালা বাজার ফাজার ভাল লাগছে না।"
চার বন্ধুই হাঁটতে লাগল।

রামসীতা মন্দিরের একদিকে মন্দির, অন্য দিকে বাগান। চাতাল আছে, কুয়ো আছে, এমন কি দু চার জনকে আশ্রয় দেবার মতন ছোট অতিথি-শালা। বাগানে দু তিনটে বসার বাঁধানো জায়গা। মাথায় ছাউনি।
মাথার ওপর আচ্ছাদন খুঁজে বসল চার জনে। শীত নেই, বসন্তের শুরু, তবু এখনও পাতলা হিম পড়ে সন্ধের পর। আজ আলোও ছিল চাঁদের। আধাআধি গোল চাঁদ।
কিছুক্ষণ বসে যেন জিরিয়ে নিল চার জনে।
মৃগেন বলল, "নীলু, একটা গান গা।"
"ধ্যুত, ভাল লাগে না।"
"কেন, তুই তো আমাদের গান শেখাচ্ছিস না ?" মৃগেন হেসে বলল।
মাথা নাড়ল নীলেন্দু। "না রে। আমার ভাল লাগছে না।"
শতদল বলল, "কেন, জায়গাটা ফাইন। কেমন চুপচাপ। গন্ধ পাচ্ছিস না ফুলের ? জ্যোৎস্না।"

"এ-সব বাইরের ভাল," নীলেন্দু বলল, "এ তো আছে, থাকবে। আমাদের জন্যে কী আছে বল?"

বন্ধুরা কথা বলল না।

শতদল আবার বলল, "তোর কিছু হয়েছে?"

"না।"

"ছাত্রীর প্রেমে পড়েছিস?"

"দূর! প্রে-ম?"

জোছন সিগারেট খাচ্ছিল। হঠাৎ টুকরোটা টোকা মেরে ফেলে দিল। বলল, "দেখ নীলু, তুই যখন বললি কিচ্ছু ভাল লাগছে না—বিশ্বাস কর —আমারও ঠিক ওই কথা মনে হচ্ছিল। কেন বল তো?"

"তুই সাঁতুর ওপর চটে গিয়ে পানুকে ঝাড়ছিলি," শতদল বলল।

"না," মাথা নাড়ল জোছন। "তার জন্যে ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ—সীতুর ওপর আমি চটে গিয়েছি। ও মদ খায় তোরাও জানিস। শালা জুয়া খেলতে গঙ্গাদের আড্ডায় যায়। জানিস? আরও কী কী করে জানিস তোরা।"

জোছন নিজেকে সামলে নিল। একবার শুধু তাকাল মৃগেনের দিকে।

মৃগেন বুঝল। "এর সঙ্গে তোর ভাল না লাগার কী আছে?"

"জানি না। তবে কিছু আছে। ...আজ সকালে দাদার সঙ্গে কথা কাটা-কাটি হয়ে গেল, বলে—তোরা সেলফিস, বাড়িঘর দাদা বাবা কারও কথা ভাবিস না, নিজেকে নিয়ে আছিস, নিজেদের সাজগোজ, ফুর্তি...। নে কথা শোন্। আমরা সেলফিস, আর ওরা একেবারে বিবেকানন্দ। অফিসে আমার বস্ লালাজী বলল, কুছ জানতা ভি নেহি, সামারু তো ভি নেহি। ওয়ার্থলেস।...কথা শোন, বেটা লালা—যে কানে পইতে জড়িয়ে পেচ্ছাপ করে—'শুদ্ধ' থাকে। তেল বেচার পয়সা নেবার বেলায় আর পইতে জড়ায় না।"

মৃগেন শতদল হেসে উঠল। নীলেন্দু শব্দ করে হাসল না।

জোছন বলল, "হাসিস না। নীলুর মতন আমারও মাঝে মঝে মনে হয়, সব বাজে, মায় আমিও। সত্যি তখন ভাল লাগে না।"

জোছন দেখতে ছিপছিপে, শক্ত গড়ন, কালো, কপালের কাছে একটা শিরা ফুলে থাকে। কথা বলে জোরে জোরে। চাঁদের আলো তার হাঁটুর ওপর পর্যন্ত পড়ে ছিল। মুখের দিকে ছায়া।

মৃগেন বলল, "তোর আজ মেজাজ ভাল নেই।"

জোছন কোনো জবাব দিল না।

শতদল বলল, "ব্যাপারটা কি জানিস, আমাদের ঠিক বনছে না।"

"কার সঙ্গে ?" জোছন তর্কের গলায় জিজ্ঞেস করল।

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিতে পারল না শতদল। পরে বলল, "বলা মুশকিল। বাড়ির সঙ্গে, মা-বাবার সঙ্গে, নিজেদের কাজকর্মের সঙ্গে।"

মৃগেন নিঃশ্বাস ফেলল বড় করে। বলল, "দেখ, আমি অত কথাটথা জানি না। একটা ব্যাপার বুঝতে পারি। আমরা—আমরা—কী বলব—মানে, আমরা এক রকম যাকে বলে রিজেক্‌টেড্‌। বুঝলি ? মানে আমাদের শালা পাছায় লাথি মেরে হটিয়ে দিয়েছে।"

শতদল বলল, "ঠিক। ঠিক বলেছিস।"

"কে দিয়েছে ?" জোছন বলল, "ফ্যামিলি ? বুড়োর দল ? মাথাঅলারা ? সোসাইটি· কিন্তু ওরা কী চিরদিন বেঁচে থাকবে ?"

নীলেন্দু বলল, "কে থাকবে কে থাকবে না সেটা বড় কথা নয়, জোছন। আমরা কেন থাকতে পারছি না। হল কী আমাদের ? আমরাও কি সীতুর মতন···"

জোছন ঝাঁপ মেরে যেন কথা থামিয়ে দিল। বলল, "না, ওসব সীতুফিতু নয়। চল্‌লু খেয়ে আর জুয়া খেলে, দুঃখের ন্যাকামি করার মধ্যে আমি নেই। ও-সব যাত্রা আসরে জমে। আমি শালা যাত্রা করতে জন্মেছি ?"

সবাই চুপ। কেউ খেয়াল করে নি প্রথমটায়, হঠাৎ কানে গেল নীলেন্দু গুন গুন করে কিছু গাইছে। কী গাইছে বোঝা যাচ্ছিল না। অস্পষ্ট, শুধু যেন সুর রয়েছে, কথা নেই। একেবারে মেঠো, দেহাতী সুরের মতন লাগছিল।

সামান্য গেয়েই থেমে গেল নীলেন্দু। তারপর বলল, "নে ওঠ, রাত হচ্ছে।"

মৃগেনই আগে উঠল। তাকে অনেক দূর যেতে হবে। সাইকেলটা চায়ের দোকানেই রেখে এসেছে।
অন্য তিন জনও উঠে দাঁড়াল।
শতদল বলল, "তুই বড় মন-মেজাজ খারাপ করে দিস, নীলু।"
জোছন বলল, "ওর আর দোষ কী! দিনগুলোই মনমেজাজ খারাপের। নে চল…"
চার বন্ধুই পা বাড়াল।

মৃগেন একা। সাইকেলটা আজ আর ঝামেলা করছে না। ভরত পাকা লোক। চেন ঠিক করে দিয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বলে দিয়েছে, এ তোমার দশ বিশ দিন, মৃগুদা! নতুন চেন কিনে নাও।
ঠিক মতন চলছিল বলে জোরেই যাচ্ছিল মৃগেন। সে ভাল সাইকেল চালাতে জানে। আজ দশ বারো বছর সাইকেল চালাচ্ছে মৃগেন এক নাগাড়ে। এই শহরে এক সময় পাঁচ মাইলের সাইকেল রেস হত। মৃগেন তিন বার ফার্স্ট হয়েছে। স্পোর্টসে তার প্রাইজ বাঁধা ছিল সাইকেলে। এখনও স্পোর্টস হয়, পাঁচ মাইলের রেসটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মৃগেন আর ও-সবের মধ্যে থাকে না। ভাল লাগে না।
স্টেশন পর্যন্ত চলে এসেছিল মৃগেন। বেশ জোরেই এসেছিল। পুরনো রেলপাড়ার এই জায়গাটা সব সময়েই গমগম করে। লোকজন আসা-যাওয়া করছে সর্বক্ষণ, পাঁচ সাতটা দোকান, সবই প্রায় মিষ্টি আর পান-সিগারেটের। এক পাল মেয়ে বউ সারাটা রাস্তা জুড়ে কলকল করতে করতে চলেছে। সবাই রেল কোয়ার্টারের। বোঝাই যায় সিনেমা দেখে ফিরছে।
কী যেন বই চলছে? ধম্মটম্মর ছবি নিশ্চয়।
ওভারব্রিজ দিয়ে উঠতে লাগল মৃগেন।
নিচে স্টেশন। দু দিকের প্লাটফর্মই ফাঁকা। এখন কোনো গাড়ি নেই। যখন গাড়ি থাকে না তখন স্টেশনের চেহারা দেখলে মনে হয়, পড়ে পড়ে

ঘুমোচ্ছে। ক'টা কুকুর ছাড়া এদিককার প্লাটফর্মে কিছু নেই। মেন্ প্লাটফর্মে দু চার জনকে চোখে পড়ে। স্টলের কাছে বেঞ্চিতে বসে আছে এক আধ-জন, অন্য দু একজন পায়চারি করতে করতে গল্প করছে।
দিদির এখন ডিউটি চলছে। ক'টা বাজল? সাড়ে আট বেজে গিয়েছে নিশ্চয়। সিনেমা ভাঙার হিসেব ধরলে সেই রকমই মনে হয়।
রাত তেমন কিছু নয়। নিজেদের বাড়িতে থাকার সময় মৃগেন দশটার আগে বাড়ি ঢুকত না, এখন তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়, অনেকটা রাস্তা। তা ছাড়া নতুন। ফাঁকা। মা ঠিক সাহস পায় না। দিদিও রাগ করে।
মৃগেনের এখনও পুরনো বাড়ির জন্যে মন-কেমন করে। বাড়ির জন্যে ঠিক নয়, অন্য কিছুর জন্যে। জন্মকাল থেকে ওই বাড়িতে মানুষ, হয়ত তাই। দিদির কোনো মায়া নেই বাড়িটার ওপর। মৃগেনের আছে। কেন আছে কে জানে। ঠাকুরদাকে সে চোখেও দেখেনি। দিদি দেখেছে। অবশ্য সবেই তখন চোখ ফুটেছে দিদির। সে-দেখা না-দেখার মতনই।
মৃগেন গড়গড় করে ওভারব্রিজের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। দাঁড়াল দু মুহূর্ত, তারপর আবার সাইকেলে চাপল। সবই এখন চুপচাপ, শান্ত। বাস স্ট্যাণ্ডে মাত্র গোটা দুই বাস, রিকশাঅলারা যে যার মতন বিড়ি ফুঁকছে, গল্পগুজব করছে, বুকিং কাউন্টারের কাছাকাছি মুসাফির খানায় শুয়ে রয়েছে ক'জন।
ভিড় কাটিয়ে ফাঁকায় এসে ডান দিকে মোড় নিতেই সেই মোরনের রাস্তা। এই রাস্তাটা মৃগেনের খুব পছন্দ। চমৎকার রাস্তা। আঁকাবাঁকা! বাঁ দিকে উঁচু জমি, যেন পাহাড়ের একটা ধাপ, মস্ত মস্ত দেবদারু আর অর্জুনগাছ, রেলের বড় বড় সাহেবদের বাংলো, তার খানিকটা ওপাশে হাসপাতাল। মোরনের রাস্তায় চমৎকার শব্দ উঠছিল চাকার। চাঁদের আলোও ধবধবে। মাঝে মাঝে গাছের ছায়া পড়েছে রাস্তায়। এলোমেলো বাতাসও রয়েছে। ডান দিকে রেলের ইয়ার্ড। মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বাতি জ্বলছে ইয়ার্ডে।
আরও নির্জনে এসে পড়ল মৃগেন। চোখ তুললে হাসপাতালটা দেখা যায়

দূরে। সামনের দিকটা।

পদ্মাকে মনে পড়ল আবার। সেই সঙ্গে সীতুকে। সীতুকে ছেড়ে দিয়েছে হাসপাতাল থেকে। সত্যি সীতু যা করল, এ-রকম কেলেঙ্কারী কখনো কোনো বন্ধু করেনি।

একটা ব্যাপারে মৃগেন বড় বেশি অবাক হয়ে গিয়েছে। সীতুর বিষ খাবার কথা কে পদ্মাকে গিয়ে দিয়েছিল। আর পদ্মাই বা কোন্ সাহসে একা একা হাসপাতাল ছুটল সীতুকে দেখতে সকাল বেলায়? মল্লিক বাড়ির মেয়েদের পক্ষে এটা খানিকটা অস্বাভাবিক। দিদিকে বাদ দিলে মল্লিক বাড়ির অন্য মেয়েদের এতটা সাহস থাকার কথা নয়। তারা যা করে চাপাচুপি দিয়ে, ভেতরে ভেতরে। পদ্মার সাহস দেখে মৃগেন সত্যিই অবাক হয়েছে। কিন্তু, সব সাহসেরই সীমা আছে। পদ্মা যদি সত্যি সত্যি সীতুকে বিয়ে-থা করে, মরবে। সীতু কতটা গোল্লায় গেছে মৃগেনও জানতে পারে নি আগে। একদিন ও-বাড়ি গিয়ে পদ্মার সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়?

মৃগেন নিজের মনেই বলল, 'দূর, বয়ে গেছে আমার!' বলেই সে মাথা নাড়ল। পদ্মার সঙ্গে সে কথা বলবে না। পদ্মা কচি খুকি নয়। স্বভাবেও খানিকটা ঝগড়ুটে। মৃগেন কিছু বলতে গেলে পালটা কী বলে ফেলবে কে জানে! যে-মেয়ে রাস্তায় তাকে দেখেও কথা বলে না—সে-মেয়ে বাড়িতে উলটো-পালটা সবই বলতে পারে। করুক যা খুশি পদ্মা। মৃগেনের কী? দিদি বোধ হয় ঠিকই বলে। মল্লিকবাড়ির কবে একদিন কী ছিল তা নিয়ে বগল বাজাবার কিছু নেই। এখনকার মল্লিকবাড়ির চতুর্দিকে ঘা।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল মৃগেন।

দারুণ দেখাচ্ছে জায়গাটা। জ্যোৎস্নায় গা ডুবিয়ে মাঠ ঘাট, ঝিল চুপ করে শুয়ে আছে। রেল লাইন দিয়ে মালগাড়ি চলেছে ঢিমে তালে। কোয়ার্টার-গুলো কেমন চুপচাপ। ছুটি বউ বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। একজন হেনা বউদি।

মৃগেন আর-একটু এগুতেই তার সাইকেলের চাকা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল। রাস্তা জুড়ে একটা পাক খেল মৃগেন, এক হাতে সাইকেলের

হ্যাণ্ডেল, অন্য হাত মাটিতে রেখে কোনো রকমে সামলে নিল নিজেকে। হাত ছড়ে গেল। যন্ত্রণার শব্দ করল মৃগেন। পায়েও লেগেছে। কোনো রকমে উঠে দাঁড়াল।

প্যান্টে হাত ঘষল। ছড়ে গিয়ে রক্তও বেরিয়েছে।

রাস্তার পাথরে লেগে সাইকেলটা ছিটকে গিয়েছিল। মৃগেন একেবারে খেয়াল করেনি। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার। সে আজকাল এত বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে কেন?

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির সদরে এসে কড়া নাড়ল মৃগেন।

"কে?"

"আমি।"

দয়াময়ী এসে দরজা খুললেন।

সাইকেলটা ঠেলে ভেতরে ঢোকালো মৃগেন।

দরজা বন্ধ করলেন দয়াময়ী।

বারান্দায় সাইকেল তুলে রেখে মৃগেন আবার একবার হাতটা দেখল। রক্ত গড়িয়ে কব্জির কাছে পড়েছে।

"মা?" মৃগেন ভাবছিল আগে হাত ধুয়ে নেবে, না, ডেটল দিয়ে কাটা জায়গাটা মুছবে?

দয়াময়ী বারান্দায় এসেছিলেন। মৃগেন হাতটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল। চোখে পড়ল দয়াময়ীর। "কী হয়েছে রে?"

"পড়ে গেলাম। সাইকেলের তলায় পাথর পড়েছিল হাতটা ছড়ে গেল।"

এগিয়ে এলেন দয়াময়ী। "দেখি?"

মৃগেন হাত দেখাল।

"ইস, অতখানি হাত কেটে এলি?"

"অতখানি কোথায়? কাঁকরে ছড়ে গিয়েছে, রক্ত পড়বে না?"

"তোর ওই সাইকেল-টাইকেল ফেল তো!···যা, হাত ধুয়ে ওষুধ লাগা।"

মৃগেনেরও মনে হল, হাতটা আগে ধুয়ে নেওয়া উচিত সাবান দিয়ে।

কেতকী ফিরল আরও খানিকটা পরে।

নিজের ঘরেও ঢুকল না। ডাকল মৃগেনকে।

মৃগেন বাইরে এল।

"তোর বন্ধুরা মদগাঁজা খেয়ে হাসপাতালে গিয়ে পড়ে থাকে?"

মৃগেন কোনো জবাব দিল না। কথাটা কানে গিয়েছে দিদির। যাওয়া অসম্ভব নয়। সীতুর ব্যাপারটা শহরে ছড়িয়েছে নানা জায়গায়।

মৃগেনের হাতের দিকে নজর পড়ল কেতকীর। "হাতে কী হয়েছে -"

একটা পাতলা ন্যাকড়া ব্যাণ্ডেজের মতন করে জড়িয়ে হাতে বেঁধেছিল মৃগেন। আয়োডিনের দাগ। গন্ধও উঠছে। "পড়ে গিয়েছিলাম। সাইকেল থেকে।"

কেতকী সন্দিগ্ধ চোখে দেখল ভাইকে। "পড়ে গিয়েছিলি না হাতাহাতি করেছিস?"

মৃগেন অবাক হল। খানিকটা ক্ষুণ্ণ। হাতাহাতি করার বয়েস তারা পেরিয়ে এসেছে। এই বয়েসেও যারা সেটা করে মৃগেনরা সে-দলেও পড়ে না। মাথা নাড়ল মৃগেন। "হাতাহাতি করব কেন?"

দয়াময়ী ততক্ষণে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, "বাড়ির কাছে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল।"

কেতকী কথাটা শুনল। দয়াময়ীকে বলল, "তোমার ছেলের বন্ধুদের কীর্তি শুনেছ?"

মাথা নাড়লেন দয়াময়ী। "না। তুই যেন কী বলছিলি কানে গেল।"

"শোনো নি তা হলে? সীতু বলে ছেলেটা, গোশালার কাছে কোথায় লুকিয়ে চুরিয়ে মদ খেয়েছিল। খেয়ে হাসপাতালে মরছিল।"

দয়াময়ী আঁতকে উঠলেন। "মদ খেয়ে মরছিল? বলিস কী? ওই ছেলে···!"

কেতকী ভাইয়ের দিকে তাকাল। বিরক্তি স্পষ্ট। রাগও। "ওই ছেলে এই ছেলে নয়; সব ক'টা ছেলেই ওই। আড্ডা, গপ্প, হই হই, সিনেমা দেখা, আর নেশা ভাঙ করা।"

মৃগেন এতক্ষণ সঙ্কোচ অনুভব করছিল। শেষের কথাটা কানে যেতে রেগে

গেল ভেতরে ভেতরে। "না, নেশাভাঙ কেউ করে না।"
"বাজে কথা বলিস না।"
"বাজে কথা! বাঃ। সীতু মদ খায় বলে আমরা সবাই মদ খাব। অদ্ভুত!"
"অদ্ভুত...," কেতকী আরও রুক্ষ হল, "অদ্ভুত আবার কী! তুই ভাবিস মানুষের কান নেই, চোখ নেই!"
মৃগেন চটে যাচ্ছিল। "তুমি যদি জোর করে বলো—করার কিছু নেই। আমার বন্ধুরা কেউ নেশাভাঙ করে না। আমি বলছি।"
"বন্ধু দেখাস না। আমি তোর বন্ধুদের জানি।...বাবা দাদার ঘাড়ে বসে খায়, চুলের বাহার করে, ভাল ভাল জামা প্যান্ট পরে আর চায়ের দোকানে বসে দাঁত বার করে বাঁদরামি করে।"
মৃগেনের মুখ কালো, চোখ রুক্ষ হয়ে উঠল। গলার নালি ফুলে উঠছিল। "তুমি শোনা কথা বলছ, বাজে কথা।"
"বাজে কথা! বেশ, তুই বল্—পদ্মা কেন হাসপাতালে গিয়েছিল। কী জন্যে?"
মৃগেন চুপ। দিদির কানে পদ্মার কথাও উঠবে সে ভাবেনি। সে নিজে কাউকে বলেনি। সামলে নিয়ে মৃগেন বলল, "আমি কেমন করে জানব পদ্মা কেন গিয়েছিল? সে গিয়েছিল, কি না গিয়েছিল আমি তাও জানি না।" মৃগেন মিথ্যেই বলল। উপায় নেই।
কেতকী বলল, "না, তুই জানিস না!" একটু থেমে হঠাৎ আবার বলল, "ও-বাড়ি গিয়েছিলি?"
"না।"
মায়ের দিকে মুখ ঘোবাল কেতকী। "তপু এসেছিল। বলল, তোমার মেজো জা—মেয়েকে চামারের মতন মার-ধোর করছে। হাতে গলায় চিমটের ছেঁকা দিয়ে সে নাকি যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছে।"
দয়াময়ী শিউরে উঠলেন। "সে কি!"
কেতকী আর দাঁড়াল না। ঘরে চলে গেল।
দয়াময়ী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। যেন কোনো কিছুই তিনি

বুঝতে পারছেন না।

মৃগেনও দাঁড়াল না, নিজের ঘরে চলে গেল।

ঘরে এসে মৃগেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর জানলার গা-লাগানো বিছানায় শুয়ে পড়ল। পদ্মা বাড়িতে মার-ধোর খেয়েছে সে জানত না। জানবেই বা কেমন করে? সমস্ত ব্যাপারটাই বলতে গেলে মৃগেনের জানা নেই। সীতু কোথায় গিয়ে চোলাই খেয়েছে, কখন হাসপাতালে গিয়েছে—মৃগেন জানত না, পদ্মাও যে হাসপাতালে গিয়েছিল—তাও তার জানা ছিল না। আর জেঠাইমা পদ্মাকে মার-ধোর করেছে—এটাও তার জানা ছিল না। সে শুধু ওভারব্রিজের সিঁড়িতে পদ্মাকে দেখেছিল। মৃগেন কোনো কিছুর মধ্যেই থাকল না, জানল না, অথচ সে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ল। দিদির ধারণা সে সবই জানে। আশ্চর্য!

রাগ হচ্ছিল মৃগেনের। দুঃখ। না জেনে-শুনে, কথা কানে না তুলে দিদি এক তরফা যা খুশি বলে গেল! সীতু তাদের বন্ধু। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই সে আলগা হয়ে যাচ্ছিল। আজকাল তেমন ঘনিষ্ঠও ছিল না। তবু বন্ধু নিশ্চয়। সীতু নেশাভাঙ করত, তারাও জানে। তার মানে এই নয় যে, মৃগেনের সব বন্ধুই নেশা করে। শখ করে, মজা দেখার জন্যে তারা লুকিয়ে চুরিয়ে একদিন কালীপূজোর সময় মদ খেয়েছে, সে নাম-মাত্র। ছেলেমানুষি নিশ্চয়। কিন্তু তাকে কী নেশাভাঙ করা বলে? দিদি বলল, তার বন্ধুরা নেশাভাঙ করে। বলল, বাপ দাদার হোটেলে খায় আর বকামি করে বেড়ায়। এটাও পুরোপুরি সত্যি নয়। জোছন চাকরি করে, তাদের অবস্থাও মোটামুটি ভাল। শতদল বার দুই চাকরি-বাকরি জুটিয়েছে—আবার ছেড়েছে। একটা ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেণ্টটেটিভ হয়েছিল, ক'মাস পরে ছেড়ে দিল, জে. এল. মেটাল ওয়ার্কসে কাজ করেছিল মাস দুই—আসা-যাওয়ার কষ্ট বলে সেটাও ছাড়ল। তার চেয়েও বড় কারণ, ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছিল তার ওপরঅলার সঙ্গে। শতোও ওই রকম। তারও খেপামি আছে, তার বাবার মতন। তবে শতোর অনেক গুণও আছে। বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দিয়ে করতে পারে। সে জোছনের মতন রগচটা নয়, অশান্তি করতে চায় না,

আবার যখন করে চরম করে। শতোর মন নরম, কোনো বাজে ব্যাপারে থাকে না। তার মধ্যে একটা দুঃখও আছে। সেটা বন্ধুরাই জানে, অন্যে নয়। নীলেন্দুকেও তো চেনে দিদি, কই তার কথা তো বলল না? সীতু মদ খায়—এটা দিদির কানে যায়, কিন্তু নীলেন্দু যে গলা ফাটিয়ে ক'টা টাকা রোজগার করে মাসে, তার মায়ের ডান হাত—দিদির কেন এটা চোখে পড়ে না? নীলু খারাপ? নীলু বকা? নীলুর মতন ভদ্র, সহিষ্ণু, শান্ত ছেলে দিদি আর-একটা বার করুক তো! মুখে যা খুশি বললেই সেটা সত্যি হয় না। লোকের মুখে ঝাল খেয়ে যা প্রাণে চাইছে বলে গেলেই কি কিস্তিমাত হয়ে যায়!

মৃগেন মনে মনে গুমরে উঠছিল। অভিমানও হচ্ছিল। দিদিয় রোজগারের পয়সায় খায় বলে যে এতগুলো কথা বলবে দিদি তাও নয়। না, সে-ধরনের ইতরতা দিদির নেই। যা বলেছে সেটা সে মনে করে। কিন্তু কেন?

ভাল লাগছিল না মৃগেনের। বাইরে গলা শোনা যাচ্ছে মার, দিদির। দিদি গা ধুতে যাচ্ছে। মা কথা বলছে উঠোনে দাঁড়িয়ে। পদ্মাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। মা তার বড় জা—মানে মেজো জেঠাইমার দোষগুণের কথা বলছে: 'মেজদির ভীমরতি ধরেছে। অত বড় স্যায়না মেয়ে, তার গায়ে কেউ হাত তোলে! ওই করেই একজন বিগড়েছে। এটাও বিগড়োবে। ছি ছি!' দিদি বলল: 'দোষ তো তোমার জায়ের। লাগাম ছাড়ার সময় মনে ছিল না, এখন শাসন!'

মৃগেনের বিরক্তি লাগছিল। বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের বাতি নিবিয়ে দিল। দিদির আর গলা শোনা যাচ্ছে না। কলঘরে চলে গিয়েছে দিদি।

বিছানায় এসে আবার শুয়ে পড়ল মৃগেন। জানলার পরদা গোটানো। খোলা জানলা দিয়ে অনেকখানি মাঠ, একটা ঢিবি, কিছু ইটের পাঁজা আর ছোট ঝোপ দেখা যাচ্ছিল। চাঁদের আলো ধব ধব করছে, বাতাসের দমকা উঠলেই শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দূরে বাঁশি বাজল এঞ্জিনের। কল-কাতার গাড়ি আসার সময় এখন।

অন্যমনস্ক, উদাস চোখে মৃগেন মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকল। গাড়ির শব্দও কানে গেল একসময়, তারপর কখন আবার সব নিস্তব্ধ।

এই সময় আশেপাশের কোনো কোয়ার্টারে কেউ রেডিয়ো খুলে দিল। কীর্তন গান হচ্ছে। কী গান বোঝাই যায় না, সুরটা কানে আসছে।

নীলুর কথা মনে পড়ল আবার। নীলু কি সত্যিই গানের টিউশানি ছেড়ে দেবে? দিতেও পারে। নীলুর স্বভাবটাই কেমন অন্য রকম। যদি সে টিউশানি ছেড়ে দেয় মাসীমার খুবই কষ্ট হবে। নীলুর ভাই বিলু এক রকম অথর্ব, তার বয়েসও কম। বিলু কোনো দিনই বিশেষ কিছু করতে পারবে না। নীলুর ঘাড়েই সারা জীবনের দায়িত্ব বিলুর।

হঠাৎ মৃগেনের মনে হল, এই যে নীলু ভাল লাগে না—ভাল লাগে না বলে একি তার দায়িত্বের কথা ভেবে? সে এই বোঝা বইতে ভয় পাচ্ছে? তার ইচ্ছে করছে না বলে?

মৃগেন মাথা নাড়ল। মোটেই তা নয়! নীলুর মনের মধ্যে কিছু হয়েছে? কি হয়েছে কেউ জানে না। জোছনও আজ কাল একই কথা বলে: দূর, আর ভাল লাগছে না। কেন? শতোরও মাঝে মধ্যে একই কথা! ব্যাপার কি!

কি ব্যাপার মৃগেন বুঝতে পারল না। তারও ভাল লাগছিল না। ওই মাঠ, জোৎস্না, এই নিস্তব্ধ পাড়া, নিজের এই ঘর কিছুই ভাল লাগছিল না। কিসের এক দুঃখ বুকের মধ্যে টনটন করছিল।

খেয়াল হল মৃগেনের মা ডাকছে। দিদির কাপড় জামা পালটানো শেষ হয়েছে। খেতে ডাকছে মা।

মৃগেন সাড়া দিল না। নিঃশব্দে বারান্দার দিকে পা বাড়াল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে কেতকী হাত-মুখ ধুয়ে উঠোন দিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। তার পরই যন্ত্রণার শব্দ করল।

মৃগেন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল। ছড়ে-যাওয়া হাতটায় ব্যথা হয়েছে বেশ।

দিদিকে সে দেখছিল।
কেতকী পিঠ নুইয়ে ডান পায়ের হাঁটু টিপে ধরেছে। বার কয়েক পা ঝটকাবার চেষ্টাও করল।
প্রথমটায় বুঝতে পারে নি মৃগেন। পরে বুঝতে পারল। তার মজা লাগছিল।
কেতকী বসতেও পারছে না, সোজা হয়ে দাঁড়াতেও নয়। হাঁটু ছেড়ে পায়ের নিচের দিকে টেপাটিপি করতে লাগল।
মৃগেন চা রেখে উঠে পড়ল।
"দাঁড়াও, ছটফট কোরো না," মৃগেন দিদির পায়ের কাছে বসতে বসতে বলল। "কাফ্ মাস্ল্-এ খিঁচ ধরেছে।"
একটা হাত জখম মৃগেনের, অন্য হাতে কী সব করল। কেতকী ভাইয়ের ঘাড়ে হাত রেখে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ঝুঁকে।
সামান্য পরেই কেতকী পা সোজা করতে পারল। সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বারান্দায় এল।
দয়াময়ী ততক্ষণে বারান্দায় এসেছে। "কী হয়েছে রে?"
মৃগেন বলল, "পায়ের ডিমে খিঁচ ধরেছিল।"
"ও! ঠিক হয়ে গেছে?"
কেতকী মাথা হেলাল। "হয়েছে খানিকটা। দাও, চা দাও।"
মৃগেন এগিয়ে এসে তার চায়ের কাপ উঠিয়ে নিল।
কেতকী বলল, "আমার মাঝে মাঝে এই রকম হয়। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ পায়ে কেমন বিশ্রী টান ধরে যায়। প্যারালাইসিস হবে নাকি?"
মৃগেন হেসে উঠল।
"হাসছিস?"
"চেয়ারে চুপ করে বসে থাকলে ক্র্যাম্প হয়। হাঁটা-চলা করো।"
"চুপ করে চেয়ারে বসে থাকি? কী বলছিস তুই?"
"তুমি নিজেই বলো: ক'টা তো মাত্র গাড়ি, চেয়ারে বসেই দিন কেটে যায়।"

কেতকী ভাইকে ধমক দিল, ভান করে বলল, "বাজে কথা বলিস না।"
মেয়ের চা নিয়ে এলেন দয়াময়ী। সঙ্গে কুচো নিমকি। ভেজে রেখেছেন আগেই। সব সময় হাতের কাছে রুটি বিস্কুট তো পাওয়া যায় না।
"আজ আমার ছুটি, মা।" কেতকী বলল।
"জানি। বলেছিস।"
কেতকী চা খেতে লাগল।
সকালের প্রথম দফায় দয়াময়ীর কিছুক্ষণ তাড়া থাকে। সংসার ছাড়াও সকাল সন্ধে বিছুক্ষণ পুজোপাঠ আছে। সকালের দিকে একেবারেই নমোনমো ; সন্ধেবেলায় সময় থাকে।
কেতকীর বিকেলের ডিউটি গতকাল শেষ হয়েছে। আজ ছুটি। আগামী-কাল থেকে সকালের ডিউটি শুরু হবে।
দয়াময়ী মেয়েকে বললেন, "আমি একটু জল দিয়ে আসি ঠাকুরকে···তুই বাজারের পয়সা দিয়ে দিস।"
চলে গেলেন দয়াময়ী। ছোট ঘরটাই এখন ভাঁড়ার আর ঠাকুরঘর।
চা খেতে খেতে কেতকী ভাইয়ের মুখ দেখল বার কয়েক। "তোর হাত কেমন আছে রে ?"
"ও, ঠিক হয়ে যাবে।"
"ব্যথা হয়েছে ?"
"একটু।"
কেতকী ভাইকে জব্দ করার জন্যে বলল, "তা হলেও ব্যথা তো রয়েছে। তুই আর কেমন করে একহাতে সাইকেল চালিয়ে বাজারে যাবি ! আমিই বরং স্টেশনের বাজার থেকে আলু বেগুন কিনে আনি।"
মৃগেন বুঝতে পারল। বলল, "বেশ তো যাও না। যা উঁচু নিচু রাস্তা দু-একবার পায়ে খিঁচ ধরতে পারে।"
হেসে ফেলল কেতকী। মৃগেনও হাসল।
খোলামেলা মজার গলায় কেতকী বলল, "এই তুই সত্যি করে বল তো ? বাজার-হাট থেকে রোজ কত পয়সা চুরি করিস ?"

মৃগেন গম্ভীরভাবে বলল, "সারা দিনে একটা টাকা হয়।"

কেতকী হেসে লুটিয়ে পড়ল।

হাসি থামলে কেতকী ভাইয়ের মুখ দেখল কয়েক পলক। তারপর নরম, নীচু গলায় বলল, "কাল তুই খুব রাগ করেছিলি ?"

মৃগেন মাথা নাড়ল। "কই ?"

"আমি তোকে চিনি না, না ?" কেতকী বলল, "আমার চেয়ে তুই চার বছরের ছোট। তোকে আমি কাঁথায় শুয়ে থাকতে দেখেছি—। কে তোকে ছেলেবেলায় ইজের-প্যান্ট পরিয়ে দিত রে ? ওস্তাদি মারছিস আমার কাছে ?"

মৃগেন সবই স্বীকার করে। জানে। ছেলেবেলায় দিদির গায়ে গা ঘেঁষে না শুলে তার ঘুম হত না। দিদির ধমক, কানমলা হজম করে সে 'অ আ' লিখতে পড়তে শিখেছিল। দিদির চড় চাপড়ও খেয়েছে কম নয়। এই ভালবাসা কোথায় কোন গভীরে জড়িয়ে আছে সে জানে। কিন্তু যা ছিল, যা আছে—তা কি আগের মতনই থাকতে পারে !

মৃগেন বলল, "তুমি রেগে গেলে যা খুশি তাই বলো।"

"সে সবাই বলে। তুই বলিস না ?"

এমন করে বলল কেতকী যে, মনে হল, রাগের মাথায় যা খুশি বলাই যেন সকলের অভ্যেস। ওতে কিছু আসে যায় না।

মৃগেন বলল, "তুমি যা বলছিলে আমরা তা নই।"

কেতকী হেসে ফেলল, "তোরা সব সোনার চাঁদ। যা আর বকবক করতে হবে না।...কী তুই বাজার যাবি, না, আমি যাব !"

"আমিই যাচ্ছি।"

"যা তা হলে ! সাইকেলে যেতে হবে না। হেঁটেই যা। একটা রিকশা ধরে নিবি।"

কথার কোনো জবাব দিল না মৃগেন। সে সাইকেল নিয়েই যাবে। উঠে পড়ল। জামা প্যান্ট বদলাতে হবে।

কেতকী আয়েস করে চা খেতে লাগল। আজ তার কোনো তাড়া নেই।

অন্য দিনও তেমন থাকে না। আজ একেবারেই নেই।

মৃগেনের কথাই ভাবছিল কেতকী। কাল তার নিজেরই খারাপ লেগেছে পরে। অনেকক্ষণ ঘুম আসে নি। ছোট ভাইকে সে বরাবরই বকাঝকা করে। সেটা নতুন নয়। তা বলে তার ভাইয়ের ওপর রাগ কিংবা জ্বালা নেই। সে এটাও মনে করে না, তার ভাই অপদার্থ। মৃগেন বাঁদর বা অসভ্য নয়। কিন্তু সে আড্ডাবাজ। সেটাও দোষের নয়। দোষের যা হল তা কেতকী ভাইকে বোঝাতে বা বলতে পারে নি। মাকেও বলে নি।

কেতকী দু চারটে অন্য রকম কথা শুনেছে। পদ্মা বেশ একটা গোলমাল পাকিয়েছে। সে সীতুর সঙ্গে এমন খারাপ ভাবে মেলামেশা করছিল যে, এখন সে বিপদে পড়ে গিয়েছে। সীতু মদ-গাঁজা খেয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকলেও তার তত ক্ষতি নেই, যত ক্ষতি পদ্মার নিজেকে নিয়ে। সীতুর যদি কিছু হয় পদ্মাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

এই ব্যাপারটা জেঠাইমা আগে ধরতে পেরেছিল কিনা কে জানে। এখন নাকি পেরেছে।

কথাটা কতখানি সত্যি, আদপেই এতটা ঘটেছে বা ঘটে নি—কেতকী জানে না। তবে কথাটা ও-বাড়ির কেউ কেউ বলছে। তপু—ওই বাড়িরই আর একজন। সেজো জ্যাঠার পোষ্য। কেতকীরই সমবয়সী। ছেলে যে ভাল তা নয়। তবে এত বড় মিথ্যে কথাটা নিজেদের পরিবার সম্পর্কে রটিয়ে যাবে তাও মনে হয় না। তপুর অনেক রাগ আছে ও-বাড়ির ওপর। থাকলেও কথাটা সে বলতে পারত না যদি না শুনত।

তপুর কাছে কথাটা আভাসে শোনা পর্যন্ত কেতকীর মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। হবার কথা। যতই কেননা কেতকী পালিয়ে আসুক ও-বাড়ি ছেড়ে তবু লোকে তো বলবে, ও ওই পরিবারেরই মেয়ে। আবার, সীতুর কথায়, আঙুল দিয়ে দেখাবে—ওই যে মৃগেনদের বন্ধু।

কেতকী কোনো কোনো জিনিস বেশি বোঝে। মৃগেন এতটা বোঝে কিনা সন্দেহ। ও-বাড়িতে থাকতেই কেতকী দেখেছে, ছেলে-মেয়েরা নানান নোংরামি দেখতে দেখতে এবং কানে শুনতে শুনতে বয়েসের তুলনায় বেশি

শিখে গিয়েছিল। ছেলেরা বাইরে বাইরে ঘোরে—তাদের সব কিছু ধরা যায় না। মেয়েদের যায়।

মল্লিক বাড়ির মেয়ে-বউদের কারও কারও স্বভাব আচার খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

বাজারের রঘুনাথ, যে খুচরো চায়ের কারবার করত, সে কেন প্রায়ই আসত ছোট বউদির কাছে? কী স্বার্থে চা এনে দিত বউদিকে? যখন সেজ জ্যাঠাইমার বাক্স থেকে সোনা চুরি নিয়ে বাড়িতে হই হই লেগে গেল, বাটি চালা আর চাল পোড়া খাওয়াবার ধুম—তখন শোনা গেল ছোট বউদি তার শাশুড়ীর বাক্স থেকে ভাঙাচোরা ছিটেফোঁটা সোনা, রুপোর টুকটাক—যা ছিল—লুকিয়ে রঘুনাথের হাতে তুলে দিত। রঘুনাথ সোনা বেচে টাকা এনে দিত ছোট বউদিকে। সেই টাকায় বউদির সাজগোজ সিনেমা দেখা, কুলপি খাওয়া—আরও এটা সেটা চলত। বউদি এতকাল যেটা বাপের বাড়ির টাকা বলে চালাত—আসলে সেটা সোনা বেচার টাকা। রঘুনাথ দু দিকেই তার লাভ পুষিয়ে নিত। সোনা বেচার পয়সা মারত, আর বউদির সঙ্গে মেশামিশিও করত। ব্যাপারটা ধরা পড়ার পর রঘুনাথ বাড়ি ছাড়ল।

এই রকম আরও একজন হল ঝরনা। বয়েসের তুলনায় বাড়ন্ত গড়ন। শাড়ি-জামা গায়ে তুলতে না তুলতেই পেকে ঝুনো। তার স্কুল যাবার রাস্তায় দু-তিনটে হারামজাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ানো আর রুমাল ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা চালাত। ঝরনার লেখাপড়া হল না—বাকি আর সব হল।

আরও কত আছে। কেতকী কোনো কোনোটা চোখে দেখেছে, কোনোটা শুনেছে। তা এসব পরের কথা। নিজের ভাইয়ের বেলায় কেতকী বুঝত, বয়েস এবং আশপাশের নোংরামি ভাইকে নষ্ট করে দিতে পারে। চোখ রাখত কেতকী। কিন্তু সে তো আর পাহারাদার নয়, চব্বিশ ঘণ্টা ভাইকে চোখে চোখে রাখতে পারে না। তা ছাড়া মৃগেনের বাইরের বন্ধু-বান্ধব আছে। থাকবে। সেটা স্বাভাবিক। কেতকীর এখনও সেই একই ভয়,

মৃগেনের বয়েস এবং তার বন্ধুরা তাকে যদি নষ্ট করে দেয়? বয়েসের কতকগুলো দোষ আছে, ভালমন্দ লাগা আছে, লোভ রয়েছে। মৃগেন তার হাত থেকে বেঁচে যাবে এমন কোনো কথা নেই। তবু তাকে বাঁচানোর চেষ্টা তো করতেই হবে।

যে যাই বলুক, কেতকী ভাইয়ের এই বন্ধু-বন্ধু ব্যাপারটায় ভয় পায়। আবার এটাও বোঝে মৃগেন ছেলেমানুষ নয়—তাকে আগলে রাখাও মুশকিল। এই দোটানা এক এক সময় কেতকীকে কেমন বিরক্ত, ক্ষিপ্ত করে তোলে। মৃগেন সেটা বোঝে না।

"কই দাও?"

চোখ ফিরিয়ে কেতকী দেখল, মৃগেন তৈরি।

উঠল কেতকী। ঘরে গেল।

সামান্য পরেই টাকা নিয়ে ফিরে এল। মৃগেন ততক্ষণে বাজারের থলি গুছিয়ে নিয়ে সাইকেলটাও উঠোনে নামিয়েছে।

"ওকি, আবার সাইকেল?" কেতকী বলল।

"দাও না। আমি এক হাতেই যা চালাব, দু হাতেও অনেকে পারবে না।"

"না, তুমি সাইকেল রাখো।"

মৃগেন শুনল না। জোর করেই সাইকেল নিয়ে চলে গেল। কেতকী সামান্য বিরক্তই হল, বড় জেদী ছেলে, আর সাইকেলটা যেন ওর গায়ের চামড়া, সর্বক্ষণ লেগে রয়েছে সঙ্গে।

উঠোনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল কেতকী। রোদে উঠোন ভরে গেল। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। ফিকে নীল। এক ঝাঁক চড়ুই পাঁচিলের ওপর সারি দিয়ে বসে আবার উড়ে গেল।

পাশের কোয়ার্টারটা ফাঁকা। এখনও লোক আসে নি। নরেন গুহ বলে একজনের আসার কথা। কেতকী চেনে না। স্টেশনের স্টাফ নয়, অফিসের লোক।

আর দাঁড়িয়ে থাকল না কেতকী। ঘরের কাজকর্ম সেরে নিতে গেল।

মৃগেনের ঘরেই ঢুকল প্রথমে। বিছানা দেখেই মাথা গরম হয়ে যায়। অত-

বড় ছেলে, বিছানায় শুয়ে ঘুমোয় না যুদ্ধ করে বোঝা মুশকিল। চাদর, বালিশের কী অবস্থা। ছি ছি। জামা প্যান্ট রাখার বাহার দেখেছ। যেখানে যা পারল গুঁজে রাখল। এমন নোঙরা অভ্যেস। বলে বলেও ছাড়ানো গেল না।

দয়াময়ীর গলা শোনা যাচ্ছে। পুজোর পাট চুকেছে। তরলা এসেছে বাসন-পত্র দিয়ে যেতে। এদিকে কাজের লোক পাওয়া কঠিন। তরলা আর কানুর মা—দু'জনেই এক রকম ভাগাভাগি করে নিয়েছে বাড়িগুলো। বাকি যারা আসে তারা ছুটকো।

বিছানা পরিষ্কার করে, মৃগেনের জামা গেঞ্জি গুছিয়ে জানলার দিকে তাকাতেই কেতকীর চোখে পড়ল, হরেনবাবু একটা খাঁচা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকাচ্ছেন চার পাশ। প্রথমটায় বুঝতে পারে নি কেতকী। পরে বুঝল। পাখিটা পালিয়েছে। ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। কেতকীর কেন যেন হাসি পেল।

বিকেলে হুট করে বেণু এসে হাজির। কেতকীর বন্ধু।

"ওমা, এই তোর কোয়ার্টার। কোথায় এসেছিস রে কেতকী! পায়ে আমার খিল ধরে গেল। ও জেঠাইমা, এখানে তো শেয়াল ডাকবে সন্ধে থেকে।"

দয়াময়ী হাসলেন। "তা মা শেয়াল আর কোথায় না ডাকে। আজ তোরা যেখানে থাকিস তার আশেপাশেও ডাকত।"

হাসাহাসি, গল্পগুজব, ঘরবাড়ি সব দেখা হয়ে গেল বেণুর। ক'টা কোয়ার্টার রে? ষোলো! দু চারটে ফাঁকা পড়ে রয়েছে এখনও! লোক আসবে! ও! তা আরও কতগুলো হচ্ছে? রেলের টাকা—মা-বাবা আছে নাকি! আলো পেয়েছিস? তবু ভাল। জলের কষ্ট রয়েছে।

বেণু কথা বলে বেশি। হাসে সব সময়।

মৃগেনকে বলল বেণু, "তুই দিন দিন এত কালো হয়ে যাচ্ছিস কেন রে? রোগাও হয়েছিস। আবার দাড়ি। মুখখানা যা করেছিস, মৃগু!'

মৃগেন হেসে হেসেই বলল, "তুমি সেদিন বললে, দাড়িতে তোকে বেশ

মানাচ্ছে, আজ আবার বলছ, মুখখানা কী করেছিস ! কোনটা যে সত্যি বেণুদি।"

"কবে বললাম তোকে ?"

"বাঃ, ভুলে গেছ। রায় কোম্পানির কাছে দেখা হল না ?"

"সে তো কবে ! তখন তোর ছোট ছোট দাড়ি ছিল। এখন বেড়ে গিয়েছে।"

সবাই মিলে হো হো করে হেসে উঠল।

বেণু নিজেই বলল, "তোর জামাইবাবু বলছিলেন-ক'টা মাস সবুর করতে। এখন বড় ডামাডোল যাচ্ছে। তোর হবে। আমি লেগে আছি। চাকরি তোর হবেই।

বিকেল পড়ল। চা খাবার খেয়ে বেণু বলল, "চল, একটু বেড়িয়ে আসি ! কাপড় পালটাতে হবে না, সামনেই বেড়াব।"

কেতকী আর বেণু বেরিয়ে এল। সামান্য পায়চারি করল কাছাকাছি, তার-পর এগিয়ে ঝিলের কাছে গিয়ে বসল। আলো রয়েছে তখনও। রোদ নেই। ছু পাঁচটা সাধারণ কথার পর বেণু বলল, "একটা কথা তোকে বলতে এলাম।"

তাকাল কেতকী।

বেণু বলল, "তুই কিছু ঠিক করলি ?"

"কিসের ?"

"ন্যাকামি করিস না ! সুজনকে বসিয়ে রেখেছিস কেন ?"

অবাক হবার মুখ করল কেতকী। "আমি কাউকে বসিয়ে রাখি নি। তুই আবার কখন তোর সুজনকে বসিয়ে রাখতে দেখলি !"

বেণু কেতকীর পিঠে চাপড় মারল। "সুজন আমার আবার হবে কেন ? আমার হল কুজন। জ্বলে মরছি তার ঠেলায়। সারাদিন তিনি তো টই-টই করছেন। কিছু বললেই চাকরির দায়িত্ব দেখায়। অমন এঞ্জিনিয়ার আমি অনেক দেখেছি। আমি বলি মিস্ত্রী। দেখ না, মেয়েটা সারাদিনে ছু ঘণ্টাও বাপের মুখ দেখতে পায় না। বিয়ে করে সুখের তো এই ঘটা হয়েছে। সংসার সামলাচ্ছি চব্বিশ ঘণ্টা।"

কেতকী হাসল। "নিজে লেজ কেটেছিস! আবার অন্যের কাটতে চাইছিস কেন?"

"আমি ভাই অনেক আগে কেটেছি। মা-বাবা দিয়ে গিয়েছে হাতে তুলে। যা দিয়েছে নিয়েছি। খারাপ তো দেয় নি।" বলে বেণু নিজেই হাসল। কেতকীও না হেসে পারল না। বেণু বড় সরল, স্পষ্ট, আন্তরিক। তার হাসিমুখের জুড়ি নেই।

"যাক গে বাজে কথা," বেণু বলল, "কাজের কথা বল! তুই এমন করছিস কেন?"

"বাঃ, আমি আবার কী করলাম?"

"কেন, সুজনকে হাঁ করে বসিয়ে রেখেছিস।"

"মোটেই নয়।"

বেণু বন্ধুর মুখ দেখল দু পলক। "তা হলে তুই আমায় মুখ ফুটে বল। আমি কথাটা মাসীমার কাছে তুলি। সুজনরা ঘর ভাল। জাতপাত নিয়েও কথা উঠবে না।"

কেতকী কোনো জবাব দিল না।

অপেক্ষা করে বেণু ঠেলা মারল কেতকীকে। "কিরে কথা বলছিস না? তুই রাজী?"

"না।"

"কেন, না কেন?"

"সুজনকে আমি বিয়েই বা করব কেন!"

বেণু নজর করে কেতকীর চোখমুখ দেখতে লাগল। "কী বলছিস! ও বেচারী কবে থেকে হাঁ করে বসে আছে তোর জন্যে।"

কেতকী ঝিলের দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বলল, "তাই নাকি? দেখেছিস তুই?"

বেণু খোঁপার কাঁটা অদল-বদল করতে করতে বলল, "দেখেছি। তুই দেখিস নি?...তোর সঙ্গে কে দেখা করতে যায় স্টেশনে, কার সঙ্গে তুই ক'দিন আগেও ঘুরে বেড়িয়েছিস?"

কেতকী বলল, "বাব্বা! তুই কি গোয়েন্দাগিরি করিস, বেণু। এত খবর তোকে কে দেয়?"

"যে দেবার সে দেয়।···না, কেতু—এ তোর বড় খারাপ হচ্ছে। তুই মিথ্যে মিথ্যে ভোগাচ্ছিস কেন বেচারীকে! ভাল ছেলে দেখতেও বিড়িঅলা নয়, লেখাপড়া করা ছেলে। কেমিস্ট। ভাল বাড়ির ছেলে—, তোর আটকাচ্ছে কোথায়?"

এবার কেতকী কোনো জবাব দিল না। ঝিলের দিকেই তাকিয়ে থাকল। আর আলো নেই। আলো ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্না ফুটছে। চাঁদও উঠে এল। আজ ত্রয়োদশী বা চতুর্দশী। ঝিলের জলে পাতলা জ্যোৎস্না পড়েছে। রাশি রাশি জল-শ্যাওলা আর শালুক পাতা ঝিলের এদিকটায়, ওদিকে মাছ ধরার পাটাতন। রেল লাইন ফাঁকা, একটা মালগাড়ি সামান্য আগে চলে গিয়েছে। ওপারে মটর ক্ষেত।

একেবারে চুপচাপ। ফাল্গুনের শুকনো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে দমকা ভাবে। বসে থাকতে থাকতে বেণু বলল, "চুপ করে আছিস যে?"

কেতকী গায়ের আঁচল গুছিয়ে বলল, "সুজন তোকে পাঠিয়েছে?"

"পাঠাবে কেন! মাঝে মাঝে বলে. গরু-চোরের মতন মিন মিন করে। তা আমার কুজন কাল বলছিল, যাও না—তোমার বন্ধুকে বলো না, বেচারাকে দগ্ধে মারছে কেন?"

কেতকী তার বিনুনি কোলের ওপর টেনে নিয়ে কালো ফিতের শেষ ফাঁসটা খুলতে লাগল। বলল, "আমি কাউকে দগ্ধে মারি নি।"

"ও!···তা তুই কি ওর মনের ভাবটাও জানিস না?"

"বুঝি।"

"তাহলে?"

"তুই আমার মনের অবস্থাটা বুঝিস না?"

বেণু কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। "তোর মনের অবস্থাটা কী?"

"আমার—কী বলবো তোকে বেণু—আমার অনেক দায়িত্ব। মৃগু চাকরি-বাকরি জোটাতে পারে নি। মা, আমি, মৃগু—তিন জনের পেট চালানোর

দায় আমার ঘাড়ে। এই চাকরি কেমন করে, কত কষ্ট করে জুটিয়েছি তুই জানিস। আমি তো চাকরি ছাড়তে পারব না। তা হলে আমার মা ভাই উপোস করবে।"

"তোকে চাকরি ছাড়তে বলেছে সুজন?"

"কেন? সেকথা উঠছে কেন!"

"তবে?"

"বলতে পারে।...ধর, আমি বিয়ে করলাম। বিয়ের পর আমার জায়গা তো শ্বশুরবাড়িতে, কে আমায় রেল কোয়ার্টারে থাকতে দিচ্ছে! শ্বশুর বাড়ির বউ হয়ে কোন মেয়ে তার মা-বাপ ভাই-বোনের জন্যেই শুধু চাকরি করতে পারে! দু দিন ওসব চলে, ছেলেরা উদারতা দেখায়, বরাবর চলে না।

বেণু কিছু ভাবল। "বেশ। কিন্তু মৃগু যদি চাকরি পায়—তখন তো সে মাসীমার দায় বইবে। তুই তো বরাবর বইবি না। তবে?"

"ও অনেক পরের কথা।" কেতকী বলল, "কবে কী হবে তার হিসেব করে কাজ করা যায় না।"

বেণু চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। পরে বলল, "তাহলে এই চাকরির জন্যে তুই বিয়ে করবি না?"

কেতকী ঘাড় ফিরিয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। "শুধু চাকরি নয়, আরও আছে।"

"শুনি।"

বলার ইচ্ছে ছিল না কেতকার, তবু বলল, "আমি রূপসী নই, আমার কোনো গুণ নেই। আজ একজন এক রকম দেখছে, কাল যদি অন্য রকম দেখে।"

বেণু এবার রাগল। কেতকী রূপসী নয়! বেশ, রূপসী নয়। কিন্তু কাকে বলে রূপসী? সোনার মতন রঙ, পটের মতন মুখ, মোমের মতন হাত-পা..., এই নাকি রূপসী? ডানাকাটা পরী? কে আছে রে পরীর মতন দেখতে এই শহরে? কেউ নেই। শ্রী আর শান্ত চেহারাই তো আসল।

কেতকীর শ্রী আছে। গায়ের রঙ চাপা। হোক না চাপা রঙ, কালো তো নয়। কেমন ঢলঢলে মুখ, ছোট কপাল, জোড়া ভুরুর তলায় ডাগর চোখ, ধবধবে দাঁত। এমন মেয়ের শ্রী নেই। কত চুল মাথায়। আর কেতকীর গড়ন তো কোথাও খারাপ নয়।

কেতকী আর মৃগেন যেন এক ছাঁদের। তফাতের বেলায়, মৃগেন মাথায় বেশ লম্বা, আরও একটু রোগা। কিন্তু ছাঁদ এক।

"এসব তোর মনগড়া কথা। আমি কী রূপসী? আমার কুজন আজ ছ' বছর তো ভাই একই ভাবে নিয়েছে আমাকে। কই, তেমন কিছু তো দেখি না।"

কেতকী হাসল। "তোর কপাল ভাল। সৌভাগ্যবতী তুই!"

বেণু আর অপেক্ষা করতে ভরসা পাচ্ছিল না। এবার তাকে উঠতে হবে। বলল, "খুব হয়েছে।...আর আমি বসব না। ওঠ।"

উঠে পড়ল বেণু। কেতকীও।

ফেরার পথে বেণু বলল, "সুজনকে আমি কিন্তু কিছু বলব না। আমার মুখ থেকে কেন বেচারী ফাঁসির হুকুম শুনবে! যা বলার তুই বলিস!"

"কেন", কেতকী বলল, "তুই না ওকালতি করতে এসেছিলি? তুই বলবি।"

"ওকালতি করতে আসি নি ঠিক। তোকে বোঝাতে এসেছিলাম? তুই বুঝি বুঝলি না।" বেণু থামল; পরে আবার বলল, "তুই আজ বুঝলি না। পরে বুঝবি। ভালবাসার সুখটাও তোর কপালে জুটবে না রে! বাঁচবি কেমন করে?"

কেতকী কোনো জবাব দিল না।

শতদল আর জোছন দাবা খেলছিল। মৃগেন এক পাশে বসেছিল। বসে বসে একটা বই দেখছিল।

জোছন অনেক ভেবেচিন্তে তার ঘোড়াটাকে এমন করে সাজাল, যেন পরের দানেই শতদলকে কাবু করতে পারে। নিজের চালে নিজেই মোহিত হয়ে মাথা দোলাতে লাগল। "সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি...। এসো

গুরু।”
শতদল মুচকি হেসে বলল, “বৎস, তুমি একটি গর্দভ।”
জোছন মাথা দোলাল। “গুরু, তুমি অতঃপর শিষ্যের একটি বংশ গ্রহণ করিবে।” বলে জোছন খুশীর ভঙ্গি করে মাথা দোলাতেই লাগল।
শতদল বলল, “করিলাম। এবং তোমার ‘গজ’-টি আমার দ্বারা ফৌত হইল।”
জোছন ততক্ষণে প্রায় আর্তনাদ করে মাথায় হাত তুলেছে। “যাঃ শালা, আমি একেবারে লক্ষই করিনি এদিকটায়। ছি ছি। একটা অফেনসিভ স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছিলাম, পেছনে বাঁশ হয়ে গেল।”
শতদল বলল, “ওই তো মজা, নিজের পাছা খোলা রেখে অন্যের ইয়েতে বাঁশ দিতে গেলে ওই রকমই হয়।” বলে শতদল শিস দিয়ে হেসে উঠল।
জোছন সবিনয়ে বলল, “গুরু, দাবা খেলায় আমি তোমার শিষ্য। তুমি আমায় ছেলেমানুষ পেয়ে খুব তড়পাচ্ছ। আর কিছুদিন যেতে দাও তোমাকে আমি বাঁশের আড়ত করে দেব।”
অট্টহাস্য হেসে উঠল শতদল আর জোছন। মৃগেনও হেসে ফেলল।
“তোরা কি শুধু দাবাই খেলবি?” মৃগেন বলল।
“এই হাতটা খেলি নিই। রাগ করছিস কেন! সোনা ছেলে—একটু বোস। নে সিগারেট খা।” জোছন প্যাকেট এগিয়ে দিল।
শতদল বলল, “আধ ঘণ্টা। তারপর বেরুব।”
মৃগেন সিগারেট ধরিয়ে আরও একটু বসে থাকল। তার ভাল লাগছিল না। এসে পর্যন্ত দেখছে, দাবা চালাচ্ছে শতদলরা। মৃগেন দাবা বোঝে না। ভালও লাগে না। জোছনও সবে শিখেছে।
ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। কখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে; দাবা নিয়ে বসে আছে জোছনরা।
মৃগেন উঠে পড়ল। “আমি বাইরে আছি। তোরা তাড়াতাড়ি শেষ কর।” ঘরের বাইরে এল মৃগেন। শতদলদের বাড়ি ছোটখাট। দোতলা। পুরনো। সামনে পেছনে বাগান। বাহারী বাগান নয়। যেখানে যা খুশি বসানো,

জবা গাছের পাশে বাতাবিলেবু। গাছপালা বাড়তে-বাড়তে ঝোপের মতন হয়ে গিয়েছে। মৃগেনদের বাড়িতেও ওই রকম হয়েছিল। তাদের বাগান ছিল বিরাট। সেই বাগান শেষে জঙ্গল হয়ে যাবার অবস্থা। বাগানটা বিক্রিও হয়ে গেল। জেঠারা তখন টাকা-টাকা করে হন্যে হচ্ছে। বাড়ি ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে। বাগানও বিক্রি হয়ে গেল। তারপর দেখতে দেখতে মল্লিকবাড়ির চারপাশ ঘিরে কত রকম ঘরবাড়ি গজিয়ে উঠল। মৃগেন তখন ছোট, কিন্তু দেখেছে ব্যাপারটা।

নিজেদের বাড়ির কথা ভাবলে মৃগেনের মনে হয় যেন কোনো গল্প। এক পুরুষে রাজা, অন্য পুরুষে ভিখিরি। অনেকটা তাই নিজের চোখে দেখা নয়, তবু মৃগেন শুনেছে সব। তার ঠাকুদা সীতাপতি মল্লিক ছিলেন দেখার মতন মানুষ। যৌবনকালে যখন তিনি ই আই রেলের কনসট্রাকশান এনজিনিয়ার তখন তাঁর প্রচুর সুনাম। বুদ্ধি, কাজের ক্ষমতা, পরিশ্রম শক্তি —কোনো দিকেই ঘাটতি ছিল না। সাহেবসুবোরা সীতাপতিকে ভাল-বাসত, তাঁর ওপর নির্ভর করত। সেই সীতাপতি যখন একাই একশো, তখন রেল লাইনে ট্রলির সঙ্গে শান্টিং ইঞ্জিনের ধাক্কা লেগে এক মারাত্মক কাণ্ড হল। সীতাপতি ট্রলি থেকে ছিটকে জঙ্গলে গিয়ে পড়লেন। লোকে ভেবেছিল, সীতাপতি ফুরিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি ফুরোলেন না, মরা-বাঁচার লড়াই জিতে বছর খানেকের মাথায় হাসপাতাল ছাড়লেন। একটা পা জখম, হাতও জখম একদিকের, বাঁ চোখে ভাল দেখতে পান না। চাকরি ছেড়ে না দিয়ে উপায় ছিল না। সীতাপতি চাকরি ছাড়লেন।

সীতাপতি জানতেনই না, তাঁর ভাগ্য তখন অনুশোচনা করছে, যা নিয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করতে চায় সাধ্যমতন। সীতাপতি অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতন নিজের যা আছে সব ঢেলে দিলেন মাটির গর্তে। একটা ছোট্ট, অচল কোলিয়ারি কিনে ফেললেন। ভেবেছিলেন, কোনো রকমে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যবস্থা করে নেবেন।

বছর দুয়েকের মধ্যে সীতাপতি বুঝলেন তিনি না জেনেই টাকার গাছ পুঁতে ফেলেছিলেন মাটির তলায়। পাতা ধরেছে গাছে। সীতাপতি বুদ্ধি-

মান, উদ্যোগী, কর্মীপুরুষ ছিলেন। শারীরিক ঘাটতি তিনি নিজের উদ্যম দিয়ে পুষিয়ে নিতেন। বছর চার পাঁচের মাথায় আরও একটা কোলিয়ারি কিনে ফেললেন। টাকার গাছ বাড়তে লাগল। ডালপালা ছড়াল। সীতা-পতি সেই গাছতলায় স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে দিব্যি দিন কাটাতে লাগলেন। ছেলেমেয়েরা দেখেছিল, তারা যে-গাছের তলায় বসে আছে তার ডাল নাড়ালেই ঝনঝন করে টাকা পড়ে। পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। তারা ডাল নাড়ানোই বেশি করে শিখল। বাবার বুদ্ধি উদ্যম, কর্মক্ষমতা তাদের ছিল না। সীতাপতি মারা গেলেন। চার ভাই তখনও টাকার ওপর হাঁটছে। দেখতে দেখতে টাকার গাছ শুকোতে লাগল। প্রথমে সেটা ধরা যেত না। তারপর চোখে পড়তে লাগল। বাইরে মামলা-মোকদ্দমা, কোলি-য়ারিতে অ্যাকসিডেণ্ট, লেবার ট্রাবল। ঘরে ভাইয়ে ভাইয়ে অশান্তি। সীতা-পতির স্ত্রীও তখন পরলোকে। ছেলেরা কোনো দিকই সামলাতে পারল না। বড় ছেলে রমাপতি একদিন মেজো ভাইয়ের বুকে বন্দুক তাক করে গুলি চালাতে গেল। শঙ্করময় রই রই পড়ে গেল। লোকে কুকথা রটাতে লাগল। সীতাপতি টাকার গাছ পুঁতেছিলেন পাঁচ পুরুষের মুখ চেয়ে। তৃতীয় পুরুষেই সে-গাছ শুকিয়ে গেল। এক সময় মল্লিকবাড়িতে পা রাখলেই টাকার পুরু মেঝেটা অনুভব করা যেত, তৃতীয় পুরুষ দেখল, সারা বাড়ির দেওয়াল থেকে শুধু অভাব আর অভাব চুঁইয়ে পড়ছে। রমাপতি ততদিনে আত্মহত্যা করেছেন, মেজো ভাই রোগে শোকে জর্জরিত হয়ে বিদায় নিয়েছেন, সেজো ভাই বুড়ো বয়েসে একটা সাইকেলের দোকানের পার্ট-নার হয়ে বসে দিন কাটাচ্ছেন। আর ছোট ভাই মারা গিয়েছেন কম বয়েসেই। বোনেরা একজন এলাহাবাদে, অন্য জন কলকাতায়। তারা আর খোঁজ খবর রাখে না।

সীতাপতির ভাগ্য বড় অদ্ভুত। নাটকীয়। কিন্তু সত্য।

মৃগেন দেখল, বাঁশরী ফটক খুলে এগিয়ে আসছে।

সিঁড়ির মুখে এসে বাঁশরী দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ তুলে বলল, "দাদা নেই?"

"দাবা খেলছে; জোছনের সঙ্গে।" মৃগেন হাসল। "কোথায় গিয়েছিলে?"
"এই একটু বেড়াতে।"
"এত সেজেগুজে?" মৃগেন ঠাট্টা করে বলল।
বাঁশরী একবার নিজের সাজ দেখে নিল। "ওমা, সাজের কী দেখলে! আমি কখ্‌খনো সাজি না। এটা ছাপা শাড়ি, রঙটা খুব সুন্দর। ডিজাইনটাও।"
মৃগেন ঘাড় হেলাল। "তুমি যা পরো, তাতেই মানিয়ে যায়।"
বাঁশরী বুঝতে পারল। জিভের ডগা বের করে ভেঙাল মৃগেনকে। পরে বলল, "তুমি দাবা খেললে না।"
"দূর ও আমি পারি না। অত ব্রেন কে খাটাবে?"
বাঁশরী ঠাট্টা করল এবার। "ব্রেন আছে?"
মৃগেনও হেসে উঠল।
আরও দু ধাপ সিঁড়ি উঠল বাঁশরী। তার হাত কবেই সেরে গিয়েছে। এক হাতে দু তিনটে রেকর্ড, অন্য হাতে একটা ঠোঙা।
বাঁশরী বলল, "পাকাওড়া খাবে?"
"পাকাওড়া! চন্নুর দোকানের। দাও? দাও …। তুমি বড় ডেনজারাস তো! তাই কেমন গন্ধ-গন্ধ লাগছে।" মৃগেন জোরে জোরে নাক টানল।
বাঁশরী এবার চোখ টান করে এক মজার ভঙ্গি করল। "তোমার নাক না হাতি। আমার গা থেকে সেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছে। সুনু লাগিয়ে দিল। বিলিতী সেণ্ট, আর তুমি পাকাওড়ার গন্ধ পাচ্ছ!" বলে বাঁশরী তার কাঁধটা এগিয়ে দিল। "শুঁকে দেখো না…।"
মৃগেন দু মুহূর্ত ইতস্তত করে সামান্য নুয়ে গন্ধ টানল নাকে। গন্ধ লাগল। ফিকে গন্ধ। কোন ফুলের মতন কেমন গন্ধ—বুঝতে পারল না।
"খারাপ গন্ধ?" বাঁশরী জিজ্ঞেস করল।
"না-না।"
"দাঁড়াও এটা ধরো। রেকর্ড। ফেলো না। সুনু নিয়ে গিয়েছিল। ফেরত দিল।"
মৃগেন রেকর্ড ধরল।

বাঁশরী ঠোঙা খুলে এক মুঠো পাকাওড়া বার করল। "নাও ধরো।"
মৃগেন হাত বাড়াল।
হঠাৎ বাঁশরী দুটো পাকাওড়া মৃগেনের মুখের কাছে ধরে হাসল, "তোমার নাকে লাগিয়ে দেব। কী পেটুক তুমি, বাবা। খালি পাকাওড়ার গন্ধ চিনেছ?" সত্যি সত্যিই মৃগেনের নাকে ছুঁইয়ে দিল তেল সমেত পাকাওড়া।
"যাঃ, এটা কী! নাকে তেল লাগিয়ে দিলে?"
"দিলাম।"
মৃগেন আর কিছু বলল না। হাসল।
বাঁশরী চলে যাচ্ছিল। মৃগেন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল; বারান্দা দিয়ে এগিয়ে দোতলার সিঁড়ি ধরে তর তর করে উঠে যাচ্ছে বাঁশরী বিনুনি দুলছে পিঠে। নাচ-নাচ ভঙ্গি করে বাঁশরী সিঁড়িব বাঁকে উঠে চেঁচিয়ে যেন কিছু বলল দোতলার কাউকে।
মৃগেন আবার শতদলের ঘরে ফিরে এল। খেলা শেষ হয়েছে। দাবার ঘুঁটি গুছিয়ে নিচ্ছিল জোছন।
"কী খাচ্ছিস রে?" শতদল বলল।
"পাকাওড়া। নে—" বলে মৃগেন শতদলের হাতে দুটো পাকাওড়া দিল। তারপর জোছনকে। জোছন হাতে নিল না; মুখ হাঁ করল।
"তুই বেটা পাকাওড়া খেতে বেরিয়ে পড়েছিলি?" শতদল জিজ্ঞেস করল।
"না রে বাবা," মৃগেন মাথা নাড়ল, "বাঁশি এক ঠোঙা পাকাওড়া কিনে বাড়ি ঢুকছিল। ক্যাচ করলাম। বাঁশি দিয়েছে।"
শতদল দু পলক মৃগেনকে দেখল, তারপর নিজের কপালে চাপড় মারার ভঙ্গি করল। "মাই ফাদার! এক ঠোঙা পাকাওড়া, তার থেকে মাত্তর চার পাঁচটা তুই হাত পেতে নিলি! তোর দ্বারা কিস্যু হবে না মৃগু! জীবনেও হবে না। তুই বেটা বাঁশিকে ভোগা মারবি তো! ইডিয়েট।"
জোছন হেসে ফেলল। "মৃগু, শতোর সেই জিলিপি ভোগা মেরে খাবার কথা তোর মনে আছে? শালা স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে মাড়োয়াড়ী ভদ্রলোকের এক ঠোঙা জিলিপি মেরে দিল।"

কথাটা মনে করিয়ে দিতেই তিনজনে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল।

বছর দুই আগেও মৃগুরা বন্ধু বান্ধব মিলে নানান কীর্তি করে বেড়াত শহরে। একবার রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে এই রকম এক কাণ্ড করেছিল। একটা এক্সপ্রেস গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। প্লাটফর্ম ভরতি লোকজন হই-হল্লা। এক মাড়োয়াড়ী ভদ্রলোক প্লাটফর্মে নেমে খাবার দাবার কিনছেন, আর জানলায় মুখ-বার-করে-বসা তাঁর দাপুটে গিন্নীর হুকুম তামিল করছেন। মৃগুরা প্লাটফর্মে গাড়ি লোকজন দেখছিল। হঠাৎ মাড়োয়াড়ী ভদ্রলোকের দিকে নজর গেল তাদের। শতদলের মাথায় কী ফন্দি খেলে গেল কে জানে। সে যেচে গিয়ে ভদ্রলোককে এখানকার খাবার-দাবার সম্পর্কে উপদেশ দিতে লাগল। 'পুরীমে খারাপ ঘিউ হ্যায় শেঠজী, মাত খাইয়ে', 'বুঁদিয়াকা লাড্ডু বহুত আচ্ছা, লে লিজিয়ে। কালা জামুন ফাস্ট কেলাস ...' এই সব করতে করতে শেষে জিলিপি। জিলিপির গুণগানে ভদ্র-লোক মুগ্ধ হয়ে পাঁচশো গ্রাম জিলিপি কিনে ফেললেন। শতদল নিজেই হাত বাড়িয়ে শালপাতার ঠোঙাটা নিল। 'শেঠজি জলদি, গাড়ি ছুট জায়গি। সিগন্যাল হো গিয়া। জলদি। আপ উঠ যাইয়ে···হাম দে দেতা হ্যায়।' ভদ্রলোক ভয় পেয়ে ব্যস্তভাবে নিজের কামরায় উঠতে গেলেন, আর শতদল মার ছুট। গিন্নী দেখতে পেয়ে চেঁচাতে লাগল। মৃগুরাও জায়গা থেকে সরে পড়ল। সেই জিলিপি খাওয়া হল প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে জলের কলের সামনে বসে। শতদল বলল, 'শালা অত্ত মেঠাই খেলে মরে যেত। বাঁচিয়ে দিলাম বেটাকে।'

হাসি থামলে জোছন বলল, "নে, চল। নীলু বসে আছে হয়ত।"

রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জোছন বলল, "সীতুর খবর জানিস?"

"না। তুই যা জানিস তাই জানি," শতদল বলল, "ও তো আর আসে নি তারপর। পানু বলছিল, বাড়িতেও থাকে না সীতু।"

"ঠিকই বলেছে। সীতু আজকাল কামাখ্যা-কবিরাজের বাড়ি গিয়ে বসে থাকে।"

"কামাখ্যা-কবিরাজ!" শতদল অবাক। "কামাখ্যার বাড়িতে তার কী?

কবরেজ তো পয়লা নম্বরের শয়তান। বেটা আবার মাদুলি টাদুলিও দেয়।"
মৃগেন বলল, "ওর আসল ব্যবসা নাকি মোদক আর মাদুলি।"
জোছন বলল, "ওর অনেক ব্যবসা আছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চালায়। অ্যাব-রসান স্পেশালিস্ট। অনেকে বলে তান্ত্রিক। ভগবান জানে!"
"নিজের বউকে মেরেছিল," শতদল বলল, "সবাই বুঝতে পারল। কিন্তু কী মজা মাইরি, পুলিস কিছুই করতে পারল না ওর।"
"পুলিসের কথা রাখ, বাবা। পুলিস কোন কাজটা পারে? ওই তো বানো-য়ারীর বাড়ির সামনে গুলি চালিয়ে তার ছোট কাকাকে মারল রামেশ্বরের দল। কী করল পুলিস? জি টি রোডের মুখে রোজ ট্রাক লুঠ হয়, কয়লা পাচার চলে, পুলিস কী করে শালা! রোজ কী রেটে এখানে ওয়াগন ব্রেকিং হয়—জানিস! ক্রিমিন্যালদের এখন পোয়া বারো এখানে।"
শতদল, মৃগেন— কেউ কোনো কথা বলল না।
এই রাস্তাটা শহরের পুরনো রাস্তা। দু দিকেই ঘর বাড়ি। বাঙালীর। দু দশ ঘর বেহারী, রাস্তাটা ভাঙা চোরা, কোথাও পিচ পাথর আছে, কোথাও নেই। বাতিও জ্বলে না বেশির ভাগ। দু পাশে হাজার রকমের ময়লা। দু দিন অন্তর ময়লা তোলা গাড়ি আসে। একেবারে নষ্ট করে ছেড়েছে পাড়াটাকে।
জোছন বলল, "আজকাল ক্রিমিন্যাল না হলে আর বেঁচে থাকা যায় না।"
শতদল এবার হাসল। "তোর মাথা গরম হয়ে উঠছে। চেপে যা।"
মৃগেন বলল, "জোছন, তুই এখনও ছেলেমানুষ থেকে গেলি।"
"হ্যাঁরে শালা, আমি ছেলেমানুষ আর তুই বুড়োমানুষ। পাকামো করিস না। তোর দিদি এখনও তোর গায়ের গেঞ্জি কিনে দেয়। চালাকি মার-ছিস?"
"এই এটা বাজে কথা," মৃগেন বিন্দুমাত্র রাগ না করেই বলল।
"বাজে কথা! আমি নিজে দেখেছি। কেতুদি বলল…"
"কবে?"

"পরশু না তার আগের দিন।"
"তুই গুল ঝাড়ছিস। দিদি গেঞ্জি কিনলে আমি জানতাম না।"
"সে কি রে! বেশ তুই জিজ্ঞেস করিস!"
মৃগেন আর কিছু বলল না। দিদি গেঞ্জি কিনেছে—অথচ সে জানে না—তার বড় অদ্ভুতও লাগছিল।
অশ্বত্থ গাছ ছাড়ালেই অন্য একটা রাস্তা এসে পড়েছে। দুটো রাস্তার মুখ ধরে সোজা এগিয়ে গেলে বাজার। বাজারের রাস্তাটা সামান্য চওড়া। পুরনো বরফকল ভেঙে সামনেই এক বড়সড় বাড়ি তৈরি হয়েছে। তার খানিকটা নিয়েছে নতুন পোস্টঅফিস, বাকিটা ইলেকট্রিক অফিস। ওই বাড়ির সামনে একটা ছোটখাট হল্লা চলছিল। কিসের হল্লা কে জানে।
মৃগেনরা এগুতে লাগল। মৃগেনের সঙ্গে তার সাইকেল।
শতদল আবার সীতুর কথা তুলল। "তা সীতু কামাখ্যার কাছে ভিড়েছে কেন?"
"জানি না," জোছন বলল, "কোনো মতলব আছে।"
"কবরেজের কাছে আবার কিসের মতলব রে! মোদক মারার তালে ঘোরে বোধহয়।"
"হতে পারে। আমি জানি না", জোছন রীতিমত বিরক্ত। "সীতুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ওকে অনেক দিন ধরেই দেখতে পারছিলাম না। তোরা গা ঘেঁষতে দিচ্ছিলি—আসত যেত—আমি কিছু বলতাম না।"
শতদল জোছনের মুখের দিকে তাকাল। "দেখ জোছন, তোর সত্যিই ছেলেমানুষি গেল না। সীতু আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু। সব আঙুল সমান হয় না। সীতু বেটা মালদার হয়ে গেল, গে-ল। তা বলে তার নাম শুনলে তুই খেপে যাচ্ছিস কেন? তুই নিজেই সীতুর কথা তুলেছিস, আমরা তুলি নি।"
জোছন প্রথমটায় কথার জবাব দিল না। গুম হয়ে থাকল। তারপর বলল, "আমি তুলেছি কথাটা। অল রাইট। কেন তুলেছি?"

"কেন তুলেছিস, বল ?" মৃগেন বলল।

"কেন তুলেছি ? তুলেছি এই জন্যে যে, তোরা ওর ব্যাপার-স্যাপার দেখে নে। বুঝে নে ওকে। কাল যদি আবার এসে ভেড়ে, তোরা তো আবার সীতু সীতু করবি।···আমি সাফ কথা বলে দিচ্ছি, সীতু যদি আবার ভেড়ে আমি কেটে যাব।" জোছন গলা তুলে কথা বলছিল। দম নিয়ে আবার বলল, "আমি লোফার নই ; লোফার হব না।"

শতদল আচমকা কেমন রেগে গেল। "লোফার তুই কাকে বলিস ?"

"সীতুকে বলি।"

"আমি সীতুর হয়ে প্লিড করছি না ; কিন্তু একটা ছেলে চোলাই খেলেই লোফার হয়ে যাবে ? অদ্ভুত তোর যুক্তি। তুই বেটা পুরুতঠাকুরের মতন পাঁচালি পড়ছিস !···সীতু হয়ত কোনো দুঃখ-কষ্ট, মন খারাপের জন্যে নেশাটেশা করে। সো হোয়াট ?"

জোছন একেবারে ফেটে পড়ল। "আবার সেই দেবদাস-মার্কা কথা। দুঃখে মদ খাই পারু। অভিমান দেখাচ্ছ শালা ! দুঃখ, কষ্ট, মন-খারাপ ! দুঃখ-কষ্টের জন্যে ভাটিখানা ? কাকে তোমার দুঃখু দেখাচ্ছ শালা ! কোন্ বেটাকে ? ···ও-সব বলিস না। তোদের দুঃখু ভাটিখানায় গলে যায়। যা রে শালা, যা দুঃখ দেখাস না ! দুঃখ, কষ্ট যেন মাথা ধরা, অ্যাসপিরিনের বদলে চোলাই পড়লেই ছেড়ে যাবে ! কেন পিঁয়াজি মারছিস ! তোদের দুঃখ হল, চুলকুনি। রগড়াতে আরাম লাগে !"

জোছনের গলা এত চড়ে গেল মনে হচ্ছিল সে ঝগড়া করছে। রাস্তার লোকজন পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখছিল তাকে। চেনে সকলেই।

মৃগেন বলল, "তুই চেঁচাচ্ছিস কেন। ফট্ করে এত চটে যাস ! তোর ব্লাড প্রেসার হবে।"

শতদল হো হো করে হেসে উঠল।

জোছন গালাগাল দিল মৃগেনকে। "তোদের পাল্লায় থাকলে আরও কিছু হতে পারে।"

হাসতে হাসতে মৃগেন বলল, "না, তোর অন্য কিছু হবে না। মাথা গরমে

হাই প্রেসার ছাড়া আর কী হবে !"

"তোর বাবার কী হয়েছিল ?" জোছন বলল, গলা অতটা আর চড়া নয়।

মৃগেন কেমন থতমত খেয়ে গেল। "আমার বাবার কথা কেন ?"

"জিজ্ঞেস করছি, বল না ?"

"রক্ত বমি আর ব্ল্যাক স্টুল। শেষে শুধু রক্ত বেরুতে লাগল।"

"আমারও তাই হতে পারে।"

"তোর কেন হবে ! বাবার পেটে আলসার ছিল। অনেক ভুগেছে বাবা।"

জোছন হাত উঠিয়ে থামতে বলল মৃগেনকে "জানি। আমরা যেন কাকাবাবুকে আর দেখিনি।...শোন, শালা—আজকাল মানুষের দশ আনা রোগ হয় রাগ আর অ্যাংজাইটির জন্যে। আলসার ইজ ওয়ান অফ দেম। হয়ত দেখবি, আমিও ফটাস হয়ে যাব আলসারে।"

শতদল বলল, "যখন হবি তখন আমরা তোর বডি নিয়ে প্রসেসান করব...। নে এখন চুপ কর।"

হাসাহাসি হল। মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল জোছনের। সে হঠাৎ রাগে আবার সহজেই তার মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

আর খানিকটা এগিয়ে গেলে বাজার। বাজারের আগে কালী মন্দির। মন্দিরের পাশে কয়েক ঘর সবজিঅলার বসতি। খাপরার চাল দেওয়া বাড়ি, ছোট ছোট খুপরি ঘরে বউ বাচ্চা নিয়ে দিব্যি থাকে। শীতেও যা বর্ষাতেও তাই। কোনো হুট রই নেই। সন্ধের পর বাড়ির সামনে খাটিয়া পেতে বসে ছেলে আদর করে, ভাঙ খায়, তাস খেলে, মাঝে মাঝে গান গায়। গানের সময় এসে পড়ল। ফাগুয়ার গান শুরু হবে।

যেতে যেতে মৃগেন বলল, "কাল প্রায় মাঝ রাত্তিরে আমাদের নতুন পাড়ায় একটা হল্লা হয়েছিল। চোর চোর বলে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। বাইরে কাউকে দেখা গেল না।"

শতদল বলল, "ফাঁকা জায়গা, চোর আসতেই পারে।"

মৃগেন সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "আমার একটা কথা মনে হল।"

"কী কথা ?"

"যিশু নয় তো ?"

"যিশু !" শতদল অবাক। "যিশুর কথা তোর মনে হলো কেন! যিশু কবে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।"

মৃগেন ধীরে ধীরে বলল, "যিশুর দাদা ওখানে থাকে। আমাদের কোয়া-র্টারের কাছেই। যিশুর মাকে আমি প্রায়ই দেখি, রাত্তিরে বাড়ির বাইরে বুড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। কত রাত পর্যন্ত থাকে ভাই।"

যিশুর কথায় কেমন যেন চুপচাপ ভাব এল তিনজনের মধ্যেই। কথাবার্তা না বলেই হাঁটতে লাগল। সেন কোম্পানির রেডিয়ো রেকর্ডের দোকানে কেউ রেকর্ড চাপিয়েছে। গান হচ্ছিল।

জোছনই কথা বলল প্রথমে, "যিশু বড় অদ্ভুত ছিল। আমি বুঝতেই পারি না।"

শতদল নিশ্বাস ফেলল। "বেঁচে থাকলে অনেক কিছু করত।"

মৃগেন বলল, "আমার কিন্তু মনে হয়, যিশু মারা যায়নি।"

"মারা যায়নি তুই বলছিস কী করে! সবাই জানে যিশু মারা গিয়েছে। পুলিসও বলছে।"

"বলুক। পুলিস নিজে দেখে নি। শুনেছে। গয়ার কাছে চলন্ত ট্রেন থেকে কে পড়ে গেল, একেবারে কেটেকুটে মাংসের তাল, মাথা মুখ নেই, সে যিশু হয়ে গেল!"

"যিশু ওই গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছিল, নঙ্গীরামের সঙ্গে। টাকা ছিল নগদ, সোনা ছিল···। যিশু বডিগার্ড হয়ে যাচ্ছিল নঙ্গীরামের এটা তো ঠিক।"

জোছন বলল, "সবই শোনা কথা। আসলটা তো আমরা জানি না। তবে যিশু তো শেষ পর্যন্ত একটা ক্রিমিন্যাল হয়ে গিয়েছিল। পিকিউলিয়ার ক্যারেকটার। তাই না ?"

মৃগেন বা শতদল কোনো কথা বলল না।

যিশু শতদলদের বন্ধু নয়। সে ছিল পলাশপাড়ার ছেলে, মৃগেনদের চেয়ে দু এক বছরের বড়। এখানকার স্কুল থেকে যিশু ভালো ভাবেই পাস করে।

তার ছবি আঁকার হাত ছিল। কলকাতায় আর্ট স্কুলে পড়তে গেল। পড়ল দু বছর। ছেড়ে দিয়ে ফিরে এল এখানে। কলকাতায় খুব কষ্ট করে পড়ত। থাকত এখানে ওখানে, হাসপাতালের পিয়ন বেয়ারাদের কোয়ার্টারে, কোনো কোনোদিন নাকি শ্মশানে বসেও রাত কাটিয়েছে। কলকাতায় থাকতেই দুটো জিনিস শিখেছিল ; গাঁজা খাওয়া আর হাঙ্গামা পাকানো। এখানে ফিরে এসে দিন কতক থাকলো বেশ, তার পরই কোথাও কিছু নেই একদিন সে সিনেমা হাউসের কাছে এক পুলিসকে পেটাল। থানা কোর্ট হয়ে ফিরে এসে যিশু গেল কয়লাখনিতে ইউনিয়ন করতে, তাকে ধরে নিয়ে গেল সোসালিস্ট পার্টির এক ছোট নেতা। কিছুদিন ইউনিয়ন করে হঠাৎ সে কোথায় গা ঢাকা দিল। তার পর শোনা গেল, যিশু কোথায় যেন ব্যাংক লুঠ করতে গিয়েছিল। পুলিস তখন থেকেই ওর পেছনে। নানান গুজব শোনা যেত যিশুর নামে। শেষ গুজব, যিশু এক কোল মার্চেণ্টের সঙ্গে তার বডিগার্ড হয়ে দিল্লী যাচ্ছিল। কেউ বলে যিশু নিজেই নঙ্গীরামের টাকা আর সোনা হাতিয়ে পালাতে গিয়ে রেলে কাটা পড়েছে। কেউ বলে পুলিস একটা জাল বিছিয়েছিল যিশুকে ধরতে। যিশু ধরা পড়ার পর—পুলিসই তাকে মেরেছে। রেলে কাটা পড়ার কথা ভাঁওতা। চায়ের দোকান পর্যন্ত কোনো কথাবার্তাই হল না।

দোকানে নীলেন্দু নেই। হয়ত বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে চলে গিয়েছে। পানুও নেই। ভিড় ভাড়াক্কাও কম দোকানে।

দোকানের বাইরে মৃগেন সাইকেল রাখছিল, শতদলরা গিয়ে ভেতরে বসল। গুপী কাছেই ছিল। চায়ের দোকানের পয়লা নম্বরের বেয়ারা। মালিক না থাকলে সে মালিকের হয়ে কাজ চালায়। খানিকটা খেপাটে।

শতদল বলল, “গুপীদা, নীলু এসেছিল ?”

গুপীকে সবাই প্রায় গুপীদা বলে। গুপীর মোটামুটি বয়েস হয়েছে, এই দোকানে সে আছে বহুকাল।

গুপী মাথা নাড়ল। “নীলুদা আসে নি।”

“সেকি ! তার তো আসার কথা ছিল !” বলে শতদল জোছনের দিকে

তাকাল।

জোছন বলল, "কোথাও আটকে আছে। আসে নি যখন তখন আসতে পারে।"

"তোমাদের চা দেব?" গুপী জিজ্ঞেস করল। "ঘুঘনি খাবে? পাঞ্জাবি ঘুঘনি?"

"সে আবার কী! ঘুঘনির মাথায় পাগড়ি আছে?"

"খেয়ে দেখ।"

গুপী হাঁক ছেড়ে চা ঘুঘনি দিতে বলল। বলেই শতদলদের কাছে এসে পিঠ নুইয়ে বলল, "কই, আমার চশমাটা করিয়ে দিলে না তোমরা?"

"মানে? তোমার চশমার জন্যে চাঁদা করে টাকা দিলাম।"

"টাকাটা চুরি হয়ে গেল যে!"

"তুমি আগে চোর ধরো, তারপর চশমা।...আর কত জুয়া খেলবে গুপীদা!"

গুপী কান মলল। জিভ কাটল। তারপর সরে গেল সামনে থেকে।

মৃগেন ততক্ষণে বসে পড়েছে।

শতদল সিগারেট চাইল জোছনের কাছে।

সিগারেট ধরাল তিনজনেই।

জোছনই আবার বলল, "নীলু কি সত্যিই গানের টিউশানি ছেড়ে দেবে?"

মৃগেন তাকাল জোছনের দিকে। চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকল।

"দেবে বলেই মনে হয়।"

"কিন্তু কেন?"

"ওর ভাল লাগছে না।"

"ওর মা, ভাই...? নিজেরই বা কি হবে? শালাকে বোঝালেও বোঝে না।"

শতদল বলল, "নীলুটা কেমন ডিসইনটারেসটেড হয়ে গিয়েছে। লক্ষ করে দেখবি, আজকাল বেটা ঠিক আগের মতন মেলামেশাও করতে পারে না। শালা আমাদের সঙ্গে যখন থাকে—শ্যাওলার মতন ভাসে। কী যে হয়েছে ওর!"

মৃগেন বলল, "ওর কিছুই আর ভাল লাগে না।"

"ভাল লাগে না?" জোছন বলল, "কথাটার মানে কী? আমারও তো

লাগে না। তোর লাগে?"

"না।" মৃগেন মাথা নাড়ল। তারও লাগে না।

শতদল অস্পষ্ট গলায় বলল, "আমারও সেই দশা। কী হল বল তো
আমাদের?"

খুঁজে খুঁজে ব্যানার্জিদাকে পেল কেতকী।

"কোথায় গিয়েছিলেন? যে-ঘরেই যাচ্ছি শুনছি, এই ছিলেন একটু আগে
বেরিয়ে গেছেন। আশ্চর্য!" কেতকী বলল হাসি মুখে।

ব্যানার্জিদা বলল, "বুকিং অফিসে ঘোষের কাছে গিয়েছিলাম। ঘোষ ইয়া
ইয়া গরম ল্যাংচা খাওয়াল। খাবি তুই?"

"না। আপনি খান।...আমি বাড়ি যাব। শরীরটা ভাল লাগছে না।
পিঠ ব্যথা করছে।"

ব্যানার্জিদার বয়েস হয়েছে। সকলের সঙ্গেই হাসি-তামাশার সম্পর্ক, দিব্যি
তুই তোকারি করেন। এই স্টেশনে নয় নয় করেও দশটি বছর রয়েছেন,
টিকিট কালেক্টর। নড়তে বললে নড়েন না। প্রমোশন এলে স্ত্রীর গুরুতর
অসুখ দেখিয়ে বসে থাকেন। বলেন, 'বেশ আছি রে ভাই, আবার নতুন
করে হাঙ্গামা কেন। আমার সংসারে খাবার লোক দুটি—আমি আর গিন্নী।
গিন্নীর আবার অম্বলের রোগ, বুকের ধড়ফড়ানি। সে আর কতটুকু খায়।
এখানেই ভাল। কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পাই, দিব্যি চলে যায় আমার।'

কেতকী ব্যানার্জিদাকে মান্য করে, ভালবাসে। ব্যানার্জিদা তার চাকরির
জন্যে কত জায়গায় কত জনকেই ধরেছেন। সীতাপতি মল্লিকের নাতনি,
তাকে একটা চাকরি দেবেন না?

ব্যানার্জিদা বললেন, "বাড়ি যাবি তো চলে যা। বসে আছিস কেন?"

"বাঃ! আপনাকে না জানিয়ে চলে যাব।"

"গেলেই বা কি! যা—বাড়ি যা। পিঠে ব্যথা হল কেন? বৃষ্টিতে ভিজেছিলি?"

"না।...ঘরে আপনার পান পড়ে আছে। সুমরু বাইরেই বসে আছে।"

"ঠিক আছে। তুই যা।"

কেতকী তৈরি হয়েই বেরিয়েছিল, অফিসে আর ফিরে গেল না। ওভার ব্রিজের দিকে হাঁটতে লাগল।

আজ একটু গা শিরশির করছে। কারণ বাদলা-বাদলা আবহাওয়া। শীত এখন শেষ, বসন্ত দেখা দিয়েছে, ভোরের দিক ছাড়া গায়ে পাতলা চাদরও দিতে হয় না, ঠিক তখন ঝম ঝম করে বৃষ্টি হয়ে গেল কয়েক পশলা। পর পর দু দিন। তারপর এই রোদ, এই মেঘলা, এখন গরম, তখন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব করে চলছে। আজ অবশ্য বিকেলের পর আবার বাদলা ভাব দেখা দিয়েছে। সকাল দুপুর খটখটে রোদ ছিল।

ওভারব্রিজের সিঁড়িতেই দেখা। সুজন।

দু জনেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুজন বলল, "কোথায় চললে ?"

"বাড়ি।"

"বাড়ি ! তোমার তো ডিউটি ছিল না সন্ধেবেলায় !"

"শরীর ভাল লাগছে না। পালাচ্ছি।"

"কী হয়েছে ? জ্বর ?"

"না, পিঠ ব্যথা।"

"চলো তা হলে।"

কেতকী জানে সুজন তার কাছেই যাচ্ছিল। আজ দিন দশেক সে আসে নি। বেণুর সঙ্গে কেতকীর কথাবার্তা হবার পর এই প্রথম সুজন এল। সে হয়ত সবই শুনেছে বেণুর কাছে। খোলাখুলি যদি নাও বলে থাকে বেণু আভাসে নিশ্চয়ই বলেছে। বেণুর স্বামী আরও স্পষ্ট করে বলে থাকতে পারে সুজনকে।

ওভারব্রিজ দিয়ে হাঁটতে লাগল দু জনে। কেতকী খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। দু জনেই মনে মনে জানে, কে কী ভাবছে।

ওপাশে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সুজন বলল, "তোমায় একটা খবর দি। আমি বাইরে একটা চাকরি পাচ্ছি।"

কেতকী দাঁড়িয়ে পড়ে তাকাল। এখানে কাছাকাছি আলো নেই ; আশে-

পাশে আছে। মুখ দেখা যাচ্ছিল সুজনের। মিথ্যে কথা, বা ধোঁকা মারা কথা সুজন বলবে না।

"কুলটিতে।"

দু মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কেতকী আবার সিঁড়ি নামতে লাগল।

সুজন বলল, "আজই চিঠি পেয়েছি। সেই কবে একটা অ্যাপলিকেশান করেছিলাম, মাস তিনেক আগে, ভুলেও গিয়েছিলাম। হুট করে আজ চিঠি এল।"

কেতকী বলল, "খুব ভাল খবর। মিষ্টি খাওয়াবে না?" হেসেই বলল কেতকী, মজার গলায়। বলার পর হঠাৎ তার মনে হল, সুজন তার এই খুশী খুশী গলার অন্য অর্থ করবে না তো? এমন কি ভাববে যে, কেতকী নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে করে খুশী হচ্ছে। কেমন যেন বিব্রত বোধ করল কেতকী।

সুজন হাসল। "সে আর এমন কি! খাওয়াব।"

নীচে নেমে এদিক ওদিক তাকাল কেতকী। বুকিং অফিসের কাউণ্টার বন্ধ। মিষ্টির দোকানে কারা যেন হাসিগল্প করছে। মুসাফিরখানায় রোজ-কার মতন কিছু যাত্রী শুয়েবসে সময় কাটাচ্ছে।

রিকশা স্ট্যাণ্ডের দিকে এগুবে কি এগুবে না ভেবে কেতকী একটু দাঁড়িয়ে থাকল। সে যদি রিকশা স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোয় সুজন বুঝেই নেবে, কেতকী বাড়ি যাবার জন্যে ব্যস্ত।

পা আর বাড়াল না কেতকী। "তুমি কী ঠিক করলে?" বলার ধরনটা এলোমেলো, যেন কেতকী নিজেই জানে না কেন কথাটা সে বলল।

সুজন বলল, "বাড়িতে কথাবার্তা হচ্ছে। মা রাজী নয়। বাবা রাজী।"

কেতকী আবার ঠাট্টা করে বলতে যাচ্ছিল, কেন—তুমি কি কচি খোকা? নিজেকে সামলে নিল সে। কোন্ কথার কী মানে দাঁড়াতে পারে কে জানে!

"বাড়ি যাবে তো?" সুজন নিজেই বলল। "চলো দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?"

"না, দাঁড়াই নি। রিকশা নিতে হবে।"

"চলো, রিকশা ধরি।"

কেতকী ঠিক বুঝতে পারল না সুজনের কথা। সেও যাবে নাকি? এখন? রাত অন্তত আটটা বাজে। ইতস্তত করল কেতকী। "খানিকটা হাঁটতে পারতাম। পিঠে ব্যথা। শরীরটা ভাল লাগছে না। রাতও হয়ে গেল।"

সুজন বলল, "হাঁটবে কেন! অতটা রাস্তা। রিকশা ধরি, চলো।"

বোঝা গেল সুজন যাবে। সে-রকমই মনে হচ্ছে ওর কথা থেকে।

সুজনই এগিয়ে গিয়ে রিকশা ডাকতে লাগল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা সাইকেল রিকশা পাক মেরে সামনে এসে দাঁড়াল।

"ওঠো," সুজন বলল।

কেতকীর তখন আর কিছু করার নেই। রিকশাঅলাও তার চেনা। নাম বোধ হয় রামবিলাস। একবার রামবিলাসের, আর-একবার সুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে সে উঠল। মাঝখানেই বসল, যেন একা যাবে।

সুজন বলল, "চলো, আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

কেতকী সরে বসল। বলতে পারল না, তুমি অন্য একটা রিকশা নাও।

সুজন উঠল। চাপাচাপি হবারই কথা। গায়ে গা লেগে থাকল।

রিকশাঅলা জানে কোথায় যেতে হবে। কেতকীকে নিয়ে গিয়েছে কতবার। রিকশা চলতে লাগল।

কেতকীর অস্বস্তি হচ্ছিল। এই ভাবে পাশাপাশি রিকশায় বসে সে কখনও কোথাও যায়নি সুজনের সঙ্গে। এমন কি সুজন যত বারই দেখা করতে বা গল্পগুজব করতে এসেছে তারা হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না হয় প্লাটফর্মে পায়চারি করতে করতে গল্প করছে। যদি বা বসতেও হয়েছে, গায়ে গায়ে চেয়ারে নয়। অন্যের চোখের সামনে তো নয়ই, আড়ালেও কেতকী সুজনকে এরকম ঘনিষ্ঠ হতে দেয় নি—যাতে কোনো ভাবেই দু জনের সম্পর্কে গল্পগুজব রটানো যায়। এ যদি বাজারের দিক হতো, কিংবা স্টেশনের পশ্চিম পাড়া—কেতকী কিছুতেই এক রিকশায় যেত না।

মানুষের চোখ কান বড় সজাগ। বিশেষ করে এখানকার। সুজনকে গা

ঘেঁষার সুযোগ না দিয়েও কেতকী বুঝেছে, স্টেশন স্টাফের অনেকেই ব্যাপারটা আন্দাজ করে।

সুজন যতটা পারে একপাশে ঘেঁষে বসে ছিল। বলল, "তোমায় পৌঁছে দিয়ে এই রিকশাতেই ফিরব।"

"মিছেমিছি," কেতকী বলল।

"কী আর, একটু বেড়ানো হবে।...আকাশও অনেক পরিষ্কার। ওদিকে তারা ফুটেছে।"

চুপ করে থাকল কেতকী। আরও গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করল নিজেকে। শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজল। পায়ের কাপড় চেপে ধরল, যেন বাতাসে না উড়তে থাকে।

সেই ঢালু রাস্তা মোরনের। বাঁ দিকে বিশাল বিশাল দেবদারু আর অর্জুন, রেলের বড় বড় অফিসারদের বাংলো। ক্লাব।

সুজন বলল, "একটা জিনিসে আমার খুব ভয় করে।"

কেতকী ডান দিকে তাকিয়ে থাকল। রেল স্টেশন, সাইডিং, ইয়ার্ড, মাল-গাড়ি সিগন্যাল।

"নতুন জায়গায় গিয়ে চাকরি করা। নতুন নতুন মানুষ। আজকাল সকলের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। নানা রকম পলিটিক্স্।"

এবারও কেতকী চুপ। বলতে পারল না, তুমি দুধের খোকা নও। সংসারে বেঁচে আছ, নিজের ঘরের বাইরে পা বাড়াতে ভয়ে মরছ!

"আবার ভাবছি—" সুজন বলল, "চাকরিটা মন্দ কী! কিছু রোজগারও বাড়বে।"

কেতকী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলল, "ওখানে থাকার ব্যবস্থা কী? এখানে বাড়িতে ছিলে।"

"ওটাও একটা ফ্যাসাদ। কোথায় থাকব জানি না। বাড়ি ভাড়া করেই থাকতে হবে বোধ হয়। কাজের লোকজন রেখে নিতে হবে রান্নাবান্নার জন্যে।"

কেতকী চুপ করে থাকল।

রিকশাটা গড় গড় করে গড়িয়ে এবার উঁচুতে উঠছে। গাছের পাতায় মাঝে মাঝে শব্দ উঠছিল। বাদলা হাওয়ার ছোঁয়া আছে এখনও। কেতকীর গা সিরসির করছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সুজন বলল, "বেণু বউদি মধ্যে এসেছিল?"

কেতকীর আচমকা যেন ভয়ের মতন হল। বুক ধকধক করে উঠল। বিব্রত, আড়ষ্ট বোধ করল। বেণুর কথা কেন তুলল সুজন, কেতকী বুঝতে পারছিল।

"হ্যাঁ, এসেছিল।" বলেই কেতকী হঠাৎ বলল, "কেন বলো তো?" এমন গলা করে বলল যেন সে জানতে চাইছে বেণুর আসার সঙ্গে সুজনের সম্পর্ক কী!

সুজন নিজেই বোধহয় ঘাবড়ে গেল। "আমাকে বলেছিল।"

"ও!"

এই সময়টায় লাইনে শুধু মালগাড়ি যায়। রেল ইয়ার্ডে একটা মালগাড়ি থেমে গিয়ে হুইসল দিচ্ছিল বিশ্রী ভাবে। সিগন্যাল পায় নি।

সুজন প্রসঙ্গটা আর ওঠাল না। অন্য কথা তুলল। তবু বেশি কথাবার্তা হল না।

রিকশা পৌঁছে গেল। এবার বাকি রাস্তাটা পায়ে হাঁটা। দিনের বেলায় তবু রিকশাগুলো মাঠ ভেঙে যতটা পারে কোয়ার্টারের কাছে চলে আসে, রাত্রে আসে না।

রিকশা থেকে নামল কেতকী।

সুজনও নেমে পড়ল। রিকশাঅলাকে বলল, একটু দাঁড়াতে সে ফিরে যাবে।

"তোমায় একটু এগিয়ে দি", সুজন বলল, "যা অন্ধকার।"

"আমার ব্যাগে টর্চ আছে।" কেতকী ব্যাগ থেকে টর্চ বার করে আলো ফেলল মাঠে।

কয়েক পা হেঁটে এসে সুজন বলল, "একটা কথা।...বেণুবউদি বলছিল, তুমি...। মানে, তোমার কিছু প্রবলেম আছে? তাই না?"

কেতকী কী বলবে বুঝতে পারল না। চুপ করে থাকল।

সুজন বলল, একটু ঝোঁক দিয়েই, "তুমি যদি বলো, প্রবলেমগুলো মিটে গেলে তুমি কোনো···মানে তুমি রাজী হও, তাহলে আমি অপেক্ষা করতে রাজী। বড় জোর বছর খানেক।" একটু থামল, আবার বলল, "নয়ত ব্যাপারটা টেনে লাভ নেই।"

কেতকী কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। সুজন একেবারে খোলাখুলি যা বলার বলেছে। এ-রকম আশা করা যায় নি। সুজন বরাবরই খানিকটা লাজুক, অন্তত কেতকীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়। এত স্পষ্ট করে সে কথা বলে না। এখন বলল।

দাঁড়িয়ে পড়েছিল কেতকী আগেই। হাতের টর্চ জ্বলছিল। হঠাৎ টর্চ নিবিয়ে দিল কেতকী। একেবারে অন্ধকার। বেশ খানিকটা তফাতে রিক-শার এক ফোঁটা আলো স্থির হয়ে আছে।

পা কাঁপল সামান্য, পিঠের ব্যথা মেরুদণ্ডকে নুইয়ে দিল। একেবারে চুপ-চাপ আর কতক্ষণ থাকবে কেতকী। শেষে বলল, "আমি তো বেণুকে সবই বলেছি।"

সুজন দু মুহূর্ত অপেক্ষা করল। "আমি তা হলে অপেক্ষা করব না?"

কেতকী চুপ। অনেকক্ষণ পরে মাথা নাড়ল, প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল, "না।"

সুজন যেন অনেকটা বাতাস টেনে নিল নিশ্বাসের সঙ্গে। চুপচাপ। বড় করে নিশ্বাস ফেলল। "বেশ।···তা হলে আসি।"

কেতকীর বুকের মধ্যে কেমন কষ্ট হল। "এসো।"

সুজন পা বাড়াচ্ছিল। অন্ধকারেই। কেতকীর কী খেয়াল হল, বলল, "আলোটা নেবে?"

"না না, চলে যেতে পারব।"

কেতকী টর্চ জ্বালল। সুজনের পথের দিকে আলো ফেলল, কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না।

সুজনকে যতটা পারল আলো দেখিয়ে টর্চটা নিবিয়ে দিল কেতকী। সুজন রিকশায় উঠেছে। রিকশা চলতে লাগল।

অন্ধকারে, মাঠে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল কেতকী। আকাশের এক কোণে অনেক তারা। ঝিলের জোলো বাতাস, মাঠের গন্ধ সবই যেন হু হু করে ভেসে এসে তাকে বড় অন্যমনস্ক, একাকী, ব্যথিত করে তুলল। কত সহজে, সাধারণ ভাবে সব মিটে গেল। যখন গড়ে উঠেছিল, তখন তিল তিল করে, দিনের পর দিন, কত রকম ছোটখাট, তুচ্ছ, অন্তরঙ্গ কথাবার্তা, ঘটনার মধ্যে দিয়ে। আর যখন ভাঙল, একেবারে সহসা। কেতকী নিশ্বাস ফেলল। নিজের বুকের কাছে আঙুল ছুঁইয়ে থাকল সামান্যক্ষণ। তারপর আবার টর্চ জ্বেলে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

দয়াময়ী দরজা খুলে দিয়ে বললেন, "তুই ? আগে আগে ফিরলি ?"

"চলে এলাম। শরীর ভাল লাগছে না।"

"কী হয়েছে ?"

"ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।" কেতকী বারান্দায় উঠে জুতো খুলে ঘরে ঢুকল।

ঘরে বাতি জ্বলছিল।

ব্যাগটা নামিয়ে রেখে কেতকী তার বিছানায় বসল। ক্লান্ত, হতাশ, গম্ভীর। খুবই অন্যমনস্ক। ঘরের জানলা খোলা। কেতকা পরদা দিয়েছে জানলায়। ঘন বাসন্তী রঙের পরদা। পরদার মাথার ওপর সামান্য ফাঁক। এখান থেকে কিছু দেখা যায় না বাইরের।

অনেকটা বেহুঁশের মতন তাকিয়ে থাকল, ঘরের এখানে ওখানে কয়েক-বার চোখ গেল। মায়ের শোবার খাট ও-পাশে। বড়সড় এক আলমারি। একপাশে আয়না। দেওয়ালে বাবার ফটো। ঠাকুরদারও। নিজেদের ছবিও আছে—বাচ্চা বয়সের। কেতকী কিছুই দেখল না, চোখে পড়ল মাত্র।

দয়াময়ী ঘরে এলেন। "ক'দিন বৃষ্টিবাদলা গেল। ঠাণ্ডা লাগতেই পারে।"

কেতকী তাকাল। হুঁশ হল।

"চা খাবি ? তোর গলাও ভারী ভারী লাগল। আদা দিয়ে করে দেব ?"

ভাল লাগছিল না কেতকীর। মা সামনে থাকলেই কথা বলবে। "খাব।"

দয়াময়ী মেয়ের কাছে এলেন, কপালে হাত দিয়ে দেখলেন। না, জ্বর আসে নি।
কেতকী বিরক্ত হল। বলল না কিছু।
দয়াময়ী চা করতে বাইরে চলে গেলেন।
শরীরের কোথায় যেন এক জ্বালার মতন লাগছে। রাগ! কেন? সুজন এত সহজভাবে চলে গেল বলে? কেতকী কি মনে মনে অন্য রকম কিছু চেয়েছিল? সে সুজনকে প্রত্যাখ্যান করবে—আর সুজন তা মেনে নেবে না, পায়ে পায়ে ঘুরবে—এটাই কি চাইছিল কেতকী? সে কি নিজেকে অপমানিত মনে করছে? নাকি কেতকী নিজেকে যতখানি মূল্যবান মনে করেছিল—সে ততখানি মূল্যবান নয়, অন্তত সুজনের কাছে, আজ সেটা জানতে পারল বলেই এত রাগ!
কেতকী উঠে পড়ল। কাপড়-টাপড় বদলে একটু শোবে।

হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় বদলে খানিকটা আরামই লাগছিল কেতকীর। চা খেল। তারপর দয়াময়ীকে বলল, "আমি ও-ঘরে গিয়ে একটু শুচ্ছি। মৃগু ফিরুক।"
দয়াময়ী বললেন, "ভাল কথা, তপু এসেছিল। বলল, তোর সঙ্গে অফিসে দেখা করে নেবে। গিয়েছিল?"
"না।"
"আমি ওকে দশটা টাকা দিয়েছি।
কেতকী হঠাৎ রেগে গেল। "দিলে কেন তুমি টাকা! ও কে তোমার? গরু চোরের মতন মুখ করে আসে, বসে থাকে, কাঁদুনি গায়। আজ টাকা দাও, কাল অমুক দাও। সেদিন ওকে এক জোড়া গেঞ্জি কিনে দিয়েছি।"
দয়াময়ী জবাব দিতে পারলেন না।

মৃগেন বাজার সেরে ফিরছিল, চোখে পড়ল মতিয়ার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু তাকে ডাকছে। সম্পর্কে দাদা, জাঠতুতো বড় ভাই। উপেক্ষা

করতে পারল না।
কাছাকাছি গিয়ে সাইকেল থেকে নামল মৃগেন।
বিষ্ণু বলল, "বাজার করে ফিরছিস? কেমন আছিস? কাকিমা কেমন আছে?"
মৃগেন বলল, "আমরা ভাল। মা এক রকম আছে।"
"তোদের কোয়ার্টারের নম্বরটা যেন কত?"
নম্বর বলল মৃগেন। "ওখানে ক'টা মাত্র কোয়ার্টার, তুমি দিদির নাম বললেই বলে দেবে।"
বিষ্ণু পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরাল। সে বিড়ি খাওয়া পছন্দ করে। সিগারেটে তার নাকি 'জমে' না।
বিড়ি ধরিয়ে বিষ্ণু বলল, "তোরা এ-বাড়িতে আসিস না। কাকিমাও আসে না। কাকিমার কথা বাদ দিচ্ছি, তোরা এত ছোটলোক হয়ে গেলি কেমন করে?"
কথাটা মৃগেনের লাগল। মুখের ওপর কিছু বলতে পারল না।
বিষ্ণু বিড়ি টেনে আবার বলল, "আলাদা হয়ে গেলে কি খোঁজ খবরও রাখতে নেই। তোরা কেমন মানুষ রে? আজ তিন চার মাসের মধ্যে একদিনও এলি না?"
মৃগেন বলল, "তুমি চার মাস কোথায় পেলে—এটা তিন মাস চলছে। মা তো আসার পরপরই বার দুই ও-বাড়িতে গিয়েছে। আমিও গিয়েছিলাম।"
"নামকে বাস্তে। তোরা গিয়েছিলি তোদের আর কী কী জিনিস পড়ে থাকল দেখতে। আসার সময় চাবি মেরে এসেছিস।"
"না, মানে ফাঁকা পড়ে থাকবে—তাই।" মৃগেনের কেমন লজ্জাই করল।
"আমায় কে বলছিল, তোরা নাকি ও-দিকটা ভাড়া দিয়ে দিবি।"
মৃগেন এমন কথা শোনে নি। মাথা নাড়ল। "না, কে বলল?"
"শুনছিলাম। কেতুর কাছে লোক আসা-যাওয়া করছে। বারণ করে দিবি কেতুকে। মল্লিকবাড়ির মধ্যে বাইরের লোক যেন না ঢোকে।"

মৃগেন কিছুই বলল না।

সামান্য চুপচাপ থেকে বিষ্ণু হঠাৎ বলল, "তুই নাকি একদিন রাজুর বাড়ি গিয়েছিলি শতোকে নিয়ে ?"

মৃগেন বেশ অবাক হল। কথাটা দাদার কানে গেল কেমন করে ? বলল, "হ্যাঁ, একটা চাকরির জন্যে গিয়েছিলাম। মাস খানেক ঘুরিয়ে দেখা করল। কে বলল তোমায় ?"

বিষ্ণু চোখ ছোট করে হাসল। "আমার কানে যায়। রাজুর বাড়িতে আমার লোক আছে। রাজু তোকে কী বলল ?"

কথাটা মনে পড়তেই মৃগেন বিরক্ত হয়ে উঠল। "বলল, চাকরি নেই। হবে না।"

"তুই আমায় বললি না কেন ?" বিষ্ণু মাতব্বরের মতন বলল।

"তোমায় ?" মৃগেন বেশ অবাক হল। বিষ্ণুর জন্যেই রাজু তাকে একেবারে পাত্তা দেয়নি।

বিষ্ণু বলল, "রাজু এখন আমাদের দারুণ খাতির করে। তুই যদি আমায় বলতিস আগে—। ওই চাকরিটা মদনকে দেবার সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। আমরাই বলেছিলাম।"

মৃগেন জানত না। বিষ্ণুর কথা বিশ্বাসও হল না। হতে পারে নাও পারে। রোদ চড়ছিল। মৃগেন আর দাঁড়াতে চাইছিল না। বলল, "আমি যাই—!"

"হ্যাঁ, যা। ভাল কথা, তুই একবার এ-বাড়ি আসবি।"

"আসব।" মৃগেন মাথা হেলিয়ে সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল বিষ্ণু আবার বলল, "সীতুরা কী জাত রে ?"

আচমকা প্রশ্নে মৃগেন কেমন থতমত খেয়ে গেল। "কেন ?"

"জানিস তুই ?"

"বামুন। পইতে পরত।"

"পইতে পরলেই বামুন হয় !···ঠিক আছে, তুই যা।"

মৃগেন সাইকেলে উঠল। বেলা হয়ে যাচ্ছে। রোদও আজকাল দেখতে

দেখতে ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার বেরুতে হবে। নীলুকে দেখতে যাবে। ক'দিন ধরে জ্বর ছাড়ছে না নীলুর। তেড়েফুঁড়ে আসছে, কমছে, আবার বাড়ছে। শীতলকাকা দেখেছেন নীলুকে। বলছেন, ম্যালেরিয়া মনে হচ্ছে, দেখি। টাইফয়েডও হতে পারে। উনি আর দু একটা দিন দেখবেন, তারপর টাইফয়েডের চিকিৎসা শুরু করবেন।

বিষ্ণুর কথাবার্তা মনে পড়ছিল মৃগেনের। রাঙাদা বড় অদ্ভুত। এমন এমন কথা বলে যেন তার মর্জিতেই জগৎ চলে। কেমন বলল, 'তুই আমায় বললি না কেন—' ; যেন রাঙাদার হাতেই চাকরিটা ছিল। রাজেনবাবুর বয়ে গিয়েছে তোমায় খাতির করতে। তুমি যা করেছিলে লোকটাকে, তারপর সে তোমায় খাতির করবে? বড় আজেবাজে কথা রাঙাদার। 'তোরা নাকি ভাড়া দিচ্ছিস?' কেন, মৃগেনরা তাদের পৈতৃক বাড়ির অংশ ভাড়া দেবে কেন? কোন দুঃখে? যদি দেয়, তোমার বলার কী আছে? সব ব্যাপারেই মাতব্বরি, রোওয়াব। আর এটাই বা কেমন কথা, তুমি আমাদের ছোটলোক বলবে। কে ছোটলোক, কে ভদ্রলোক—তোমার কাছে শিখতে হবে?

মৃগেন এটাও বুঝতে পারল না, রাঙাদা হঠাৎ সীতুর কথা তুলল কেন? জাতের কথাই বা কেন বলল।

সীতুর সঙ্গে তাদের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তাঘাটে দু একবার সীতুকে দেখলেও তারা কেউ ডাকে নি সীতুকে। সীতুও সকলকে এড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছে। জোছন আজকাল সীতুর নাম পর্যন্ত শুনতে পারে না, রেগে আগুন হয়ে যায়। মৃগেন, শতো, নীলু—কেউই খুশী নয় সীতুর ওপর। কিন্তু তারা জোছনের মতন খাপ্পাও নয়।

বন্ধুদের মধ্যে এক পানুর সঙ্গে সীতুর দু একটা কথা হয়। পানুও বলছিল, সীতু একেবারে অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। দাড়ি রাখছে, রোগা হয়ে গিয়েছে, কথা বলার সময় তোতলাম, খেপাটে খেপাটে দেখায় তাকে। তা ছাড়া সীতুকে দেখলেই মনে হয়, সব সময় কেমন ভয়ে ভয়ে মরছে।

মৃগেন সরাসরি স্টেশনের দিকে না গিয়ে অন্য পথ ধরল। রেল ফটক

দিয়ে শর্ট কাট করবে।

হাত ধুয়ে এসে মৃগেন বলল, "রাঙাদার সঙ্গে দেখা হলো।"
দয়াময়ী আনাজ পত্র আলাদা করে বেছে নিচ্ছিলেন, ধুতে বসবেন। "বিষ্টু! কী বলল! ও-বাড়ির সব কেমন আছে?"
"তা বলল না। আমাদের ছোটলোক বলল।"
হাতের কাজ থামিয়ে দয়াময়ী ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। "কেন?"
"ও-বাড়িতে যাই না বলে।"
"ও!...এমনিই বলেছে।"
"বলবে কেন?...বলল, আমরা নাকি ওবাড়ির ঘরটর ভাড়া দেবার কথা-বার্তা বলছি।"
"ভাড়া?" দয়াময়ী আকাশ থেকে পড়লেন। "কে বলল? নিজেদের বাড়ি ভাড়া দেব?"
"দিদি সব ব্যবস্থা করছে। রাঙাদা বলল, বারণ করে দিবি কেতুকে। শাসাল।"
দয়াময়ী বিরক্ত হলেন। "মিথ্যে কথা। খুকি আমাকে কিছু বলে নি। ভাড়া দেবে কেন?" বলে আনাজ আর মাছ আলাদা করে উঠোনের একপাশে রেখে চলে গেলেন। পরে ধোবেন। তার আগে হাত ধুয়ে মৃগেনকে জল-খাবার খেতে দেবেন।
বালতির জলে হাত ধুয়ে দয়াময়ী নিজেই বললেন, "মনে মনে কে কি ভাবে—আমায় তো বলতে আসে না। জানি না।" গলার স্বরে ক্ষোভ, অপ্রসন্নতা। মেয়ের ওপরেই বোধ হয়।
মৃগেন একবার ঘরে গেল। ফিরে এল সামান্য পরে।
দয়াময়ী রান্নাঘর থেকে রুটি আর বেগুন ভাজা এনে ছেলের হাতে দিলেন। মুখ কেমন গম্ভীর।
মৃগেন বলল, "তুমি একবার ও-বাড়িতে ঘুরে এসো।" বলে মৃগেন হাসির মুখ করল, "তোমায় বাদ দিয়েছে। কাকিমা তো! আমি আর দিদি

ছোটলোক।”

দয়াময়ী বললেন, “যেতে চাইলেও কে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার দিদি তো ও-বাড়ির গন্ধ নাকে লাগলে ভিরমি যায়। আর তুমি তো দুপুর রাতটুকু ছাড়া বাড়িতেই থাকো না। আমি সারাদিন বাড়ি পাহারা দিচ্ছি আর সংসার সামলাচ্ছি। যাব কখন?”

মৃগেন রুটি মুখে পুরে বলল, “দিদির এখন সকালে ডিউটি চলছে, বিকেলে বাড়িতেই থাকে। একদিন তুমি চলো, আমি নিয়ে যাব।”

দয়াময়ী বললেন, “তোমার দিদিকে জিজ্ঞেস করে তবে আমায় যেতে হবে। অমন যাওয়া আমি যাব না। নিজের শ্বশুরবাড়ি, স্বামীর ভিটেয় যাব তার জন্যে আমায় মেয়ের কাছ থেকে মত নিতে হবে। গলায় দড়ি আমার।”

মৃগেন বুঝতে পারল, মা রেগে যাচ্ছে। মা'র রাগ জ্বালা কম। কিন্তু অভিমান খুব। দিদির ওপর মাঝে মাঝে মা'র অভিমান এত বেশি হয় যে সারা দিনে দু একটার বেশি কথাও বলে না।

মৃগেন মা'র অভিমান সামলাতে বলল, “ঠিক আছে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। দিদিকে কিছু বলতে হবে না।”

“তুমি আমার সবই করবে।” দয়াময়ী আর দাঁড়ালেন না। রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

মৃগেনের কেন যেন হাসি পেল। মার সঙ্গে দিদির যেমন অমিল, আবার মিলও অনেক। দিদি বেশি রাগারাগি করলে কিংবা অসন্তুষ্ট হলে ঝপ করে কথা থামিয়ে সামনে থেকে চলে যায়।

মৃগেন খাওয়া শেষ করতে লাগল।

খানিক পরেই দয়াময়ী ফিরে এলেন চা নিয়ে। বললেন, “আমি তোমাদের মতি-গতি বুঝি না। কার কখন কী হয়। তোমার দিদি আজ ক'দিন ধরে যেন আষাঢ়ে মেঘ হয়ে আছেন। অফিস যাচ্ছেন, বাড়ি আসছেন, শুয়ে থাকছেন বই মুখে করে। ব্যস। নেহাত যখন আর শুয়ে থাকতে পারেন না—একটু আধটু কাজকর্ম করছেন সংসারের। হাজার বার বলো, কী হয়েছে রে?—মুখে বলবেন কিছু না, অথচ চোখমুখ দেখলে বোঝা

যায় অনেক কিছু হয়েছে। তা আমি কি ভগবান, যে তোমাদের মনের কথা বুঝব !" দয়াময়ী থামলেন কয়েক দণ্ড, তারপর বললেন, "বাপের যত বদগুণ সব তোমাদের দু জনে বর্তেছে। সেই মানুষটা তো কোনো দিন জানতেই দিল না—তার মনে কী আছে, আর মুখে কী আছে। গেল যখন, তখনও কি একবার তার মনে হয়েছিল—সকাল থেকে শরীর খারাপ, একবার অন্তত আমায় বলে ! সে শত্রুতা করে গেছে, তোমরাও করবে। আমার কপাল।"

মৃগেন একেবারে বোকা। সে বুঝতেই পারে নি সামান্য একটা কথা থেকে এতদূর গড়াতে পারে। বুঝলে কথাটা এখন তুলত না।

দয়াময়ী সোজা উঠোনে চলে গিয়েছিলেন। আনাজ ধুয়ে নেবেন। মাছ কুটবেন।

চা শেষ করে মৃগেন যেন পালাতে পারলে বাঁচে। মা আজ খুবই রেগে আছে। এত কথা একটানা মা বড় একটা বলে না। রাগটা কী দিদির ওপর ? মেয়ের ওপর ঝাল ঝাড়তে পারছে না বলে ছেলের ওপর ঝেড়ে দিল। না, মৃগেন তাতে কিছুই মনে করে না। তার রাগ হয় না, অভিমানও নয়।

মৃগেন একটু অসুবিধেয় পড়ে গেল। তার গোটা পাঁচেক টাকা দরকার। মা'র কাছে চাইলেই পাওয়া যায়। কিন্তু এখন যেরকম মেজাজ মা'র, টাকাটা চাইতেই অস্বস্তি হচ্ছিল।

চা শেষ করল মৃগেন। ঘরে গেল, বাইরে এল। মাকে দেখল। কাক তাড়াল। নিজের খেয়ালেই উঠোনের কাপড়-শুকোবার দড়িটা টান করে বেঁধে দিল। তারপর বলল, পাঁচটা টাকা দেবে ?"

দয়াময়ী কানে কথাটা যেন শুনতেই পেলেন না। মৃগেন আর-একবার বলল।

দয়াময়ী বললেন, "আমার টাকা নেই। দিদির টাকা। দিদির কাছে চেয়ো।"

মৃগেনের চোখমুখ গরম হয়ে উঠল।

খানিকটা বেলা হয়ে গেল মৃগেনের। নীলেন্দু বিছানায় শুয়ে ছিল চুপ করে। শতদল নেই।

"শতো আসে নি?" মৃগেন জিজ্ঞেস করল।

বিছানায় উঠে বসতে বসতে নীলেন্দু বলল, "এসেছিল। তোর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ও একবার ওর বাবার চেম্বারে গেল। খবর দিয়ে আবার আসবে।"

"কেমন আছিস তুই?"

"জ্বর রাত্তিরে ছেড়ে গিয়েছিল। সকালে আবার একটু এসেছে। সামান্য।"

মৃগেন হাতের ঠোঙাটা একপাশে রাখল।

ঠোঙাটার ওপর চোখ আগেই পড়েছিল নীলেন্দুর। বলল, "তুই আবার ফল এনেছিস?"

"আবার কোথায়। এই একবার।...ক'টা কমলা আছে, আর বেদানা একটা। সতুয়া নিজের হাতে বেছে বেছে দিয়েছে।" বলে মৃগেন হাসল।

নীলেন্দু হাসি মুখেই বলল, "তোরা আমায় একেবারে রুগী বানিয়ে ছাড়লি।"

মৃগেন একবার দরজার দিকে তাকাল। পায়ের শব্দ পেয়েছিল। মাসীমা নিশ্চয়। কেউ ঘরে এল না।

"দে একটা লেবু খাই," নীলেন্দু বলল।

"খাবি? দাঁড়া, ধুয়ে আনি।"

মৃগেন ঠোঙা থেকে লেবু বার করল। করে বাইরে গেল। নীলুর বাড়িতে তাদের কোনো বাধো-বাধো ভাব নেই।

বাইরে একফালি ঢাকা বারান্দা। সামান্য উঠোন। নীলেন্দুর মা কাছাকাছি ছিলেন। কাজ করছিলেন। মৃগেন নিজেই লেবু ধুয়ে আনার জন্যে জল খুঁজছিল। "মাসীমা?"

"এই যে বাবা।"

"একটু জল দিন।"

শান্তিলতা এগিয়ে এলেন। "ধুয়ে নেবে? দাও ধুয়ে দি।"

মৃগেন দাঁড়িয়ে থাকল। নীলুর ভাইকে দেখতে পাচ্ছে না। হয়ত ও-ঘরে

আছে। বিলুর দুটো পা সরু সরু, এক পায়ের পাতাও সামান্য বেঁকা। পোলিও হয়েছিল কোন ছেলে বয়েসে। ছেলেটার সারা জীবনই নষ্ট হয়ে গেল। ভাল করে হাঁটতে পারে না। ক্রাচ নিয়েই চলা-ফেরা। বাড়িতে বসে বসে নিজেই ছবি আঁকতে, পুরনো গ্রামোফোন রেকর্ড বেঁকিয়ে ফুল-দানি, পাখি—কত রকম কী করতে শিখেছে। আজকাল আবার ঘরে বসে বসে এটা-সেটা সারাই করে।

শান্তিলতা ফিরে এলেন।

মৃগেন বলল, "নীলুর জ্বর কত, মাসীমা ?"

"একশো মতন। কাল রাত্তিরে জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল।"

"ও তা হলে ম্যালেরিয়া !"

"তাই হবে।"

মৃগেন লেবু ছাড়াতে ছাড়াতে ঘরে ঢুকল। নীলেন্দুর বিছানায় গিয়ে বসল। "নে, খা।"

হাত বাড়িয়ে লেবু নিল নীলেন্দু। কোয়া ছাড়িয়ে মুখে দিল। "মিষ্টি রে ! ভাল লেবু।"

মৃগেন কেমন আরাম পেল। এই ফলগুলো সে সতুয়ার দোকান থেকে ধারে এনেছে। টাকা-পয়সা ছিল না। পাঁচটা টাকা চেয়েছিল মার কাছে, পায় নি। মা'র মেজাজ খারাপ না থাকলে পেত। সামান্য কথা থেকে কোথায় কী হয়ে গেল কে জানে, মা একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল। তবু মৃগেনের বেশ লেগেছে মনে। সে মা বা দিদির কাছে যখন তখন টাকা চায় না। তার কোনো আজেবাজে খরচ নেই। জামাপ্যান্টের শখ নেই তার। টুকটাক খরচ বলতে হয়ত দু কাপ চা, দু চারটে সিগারেট। আড্ডার খরচ বেশির ভাগ সময়ে জোছনই দেয়। বাড়িতে তার কোনো দায় দায়িত্ব নেই ; মাইনের টাকা-পয়সা বন্ধুদের জন্যেই খরচ করে। শতদলও পয়সা কড়ি দেয়। তারই বা কোন অভাব। মৃগেন আর পানুই হাত খুলতে পারে না।

আজ ক'দিন ধরে, নীলুর অসুখের পর, জোছন দু তিন দিন ফলটল নিয়ে

এসেছে বন্ধুর জন্যে। শতদলও এনেছে। তা ছাড়া শতদলও তার বাবাকে এনে নীলেন্দুকে দেখিয়েছে; নিজেই অনেক সময় ওষুধপত্র এনে দেয় বাবার ডিসপেনসারি থেকে। মৃগেনই কিছু আনতে পারছিল না। তার লজ্জা করত। দু চার টাকার ফলও সে আনতে পারে না একদিন। আজ আনবে ভেবেছিল। নিয়ে এসেছে, কিন্তু ধারে।

নীলেন্দু লেবু খেতে খেতে বলল, "আজ জ্বর ছেড়ে যাবে? কী বলিস?"

মৃগেন সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সামলে নিল। "মনে তো হচ্ছে। শেতলকাকা ঠিকই বলেছিলেন, ম্যালেরিয়া।"

"টাইফয়েড হলে ভীষণ ভোগাত।"

দুজনে ছোটখাট কথা বলতে লাগল।

নীলেন্দুর ঘরের ওপাশে সরু মতন গলি। গলির মোড়। মোড়ের মাথায় একটা অকেজো টিউবওয়েল, চৌকোণো এক ডাস্টবিন। গোটা তিনেক কুকুর বাচ্চা খেলা করছে।

কী কথায় হেসে উঠে নীলেন্দু কিছু বলছিল শান্তিলতা ঘরে এলেন। চা এনেছেন মৃগেনের।

মৃগেন বলল, "আবার চা আনলেন মাসীমা?"

"তাতে কি! খাও।" বলে শান্তিলতা ঘরের অন্য দিকে সরে গিয়ে ময়লা জামাকাপড় বেছে নিলেন, বোধহয় কাচতে দেবেন। "আজ কতদিন ধরে ভাবছি একবার তোমাদের নতুন বাড়িতে যাব। যাওয়া হচ্ছে না। নীলু সেরে উঠুক যাব একদিন। দিদিকে বলো।"

মাথা নাড়ল মৃগেন। "আমায় বলবেন, নিয়ে যাব।"

নীলেন্দু ঠাট্টা করে বলল, "তোর সাইকেলে চাপিয়ে? মাকে মারবি।"

হাসাহাসি হল। শান্তিলতা চলে গেলেন।

মৃগেন বলল, "শতো কখন আসবে রে?"

"আসবে। ওর আবার গার্জেনগিরি আছে। কত কি জিজ্ঞেস করে আসবে —দেখ না।"

আবার এ-কথা সে-কথা। নীলেন্দু আরও আরাম করে বসবার জন্যে মাথার

বালিশটা কোলে তুলে নিচ্ছিল ওর চোখে পড়ল খামটা। বালিশের তলায় চাপা ছিল। নীলেন্দু খামটা তুলে নিল। "মৃগু ?"

"বল।"

"তোকে একটা কথা বলব ?"

নীলেন্দুর ইতস্তত ভাব দেখে মৃগেন অবাক হল। "কী ?"

"সীতু আমায় একটা চিঠি দিয়েছে। কাল রাত্তিরে গগা এসে দিয়ে গিয়েছে। খামের মুখ আঁটা ছিল।"

মৃগেন আরও অবাক হচ্ছিল। সীতু চিঠি লিখবে ? কেন ? সীতুর বাড়ি এমন কিছু দূরে নয়। সে নিজে একদিনও আসে নি নীলুকে দেখতে। চিঠি লিখতে গেল কেন ?

নীলেন্দু বলল, "চিঠিটা দেখানো উচিত নয়। তবু তুই দেখ।"

খাম থেকে চিঠি বার করে কাগজটা বাড়িয়ে দিল নীলেন্দু।

মৃগেন চিঠি নিল। সীতুর যা বিশ্রী হাতের লেখা ! চিঠিটা পড়ল মৃগেন।

"নীলু, তোর খুব অসুখ শুনেছি। রোজই ভাবি, তোকে দেখতে যাব। যেতে পারি না। লজ্জা করে। মাসীমা কী ভাববেন। শতো জোছন মৃগু —রোজই তোর কাছে যায়। তারা আমায় দেখলে চটে যাবে। আমি সব জানি। শুনেছি। ওরা যখন থাকে না তখন যেতে পারি। মাসীমা থাকবেন ভেবে তাও হয় না। তুই কেমন আছিস ? তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ। তোর সঙ্গে আমার ক'টা কথা আছে। আমি যে কী অবস্থায় আছি তোরা ভাবতেও পারবি না। লোকের কথা বিশ্বাস করিস না, নীলু। আমার কথা কেউ জানে না। একদিন সত্যিই আমি বিষ খাব। তুই ভাল হয়ে ওঠ, তাড়াতাড়ি। সীতু।"

মৃগেন বার দুই চিঠিটা পড়ল। পড়ে নীলেন্দুর দিকে তাকাল। নীলেন্দু চশমা মুছছে।

নীলেন্দু বলল, "বেচারা খুব লজ্জায় পড়েছে ! তাই না ?"

"হুঁ !...তা আমরা তো ওকে আসতে বারণ করি নি। আমরা যখন থাকি না, এলেই পারে।"

“মা থাকে।”

“তা আমরা কী করব।” মৃগেন চিঠিটা ফেরত দিল।

নীলেন্দু বলল, “জোছনদের এই চিঠির কথা বলিস না। চটে যাবে। কাউকে কিছু বলতে হবে না।” বলে একটু থামল নীলেন্দু, ভাবল কিছু, বলল, “পানুটা বোকা। তোর সঙ্গে দেখা হয় না সীতুর?”

“না। রাস্তায় দু একদিন দেখেছি।”

“একদিন দেখা কর না। কী বলছে শোন। আমরা যা শুনেছি তার কতটা সত্যি কে জানে! সীতু নিশ্চয়ই কোনো ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আছে।”

মৃগেন বলল, “সীতুর কাছে আমি যাব না। আমার কোনো দরকার নেই।”

বাড়িতে কেতকী একলাই ছিল। দয়াময়ী কাছাকাছি কোনো কোয়ার্টারে গল্পগুজব করতে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে যান। তাঁর কাছেই আসে অনেকে মেয়ে-বউরা। দু একজন সমবয়সীও আছেন; মিত্তিরবাবুর মা, সুনীলের ঠাকুমা। দয়াময়ী যে-ধরনের সংসারে এতকাল জীবন কাটালেন সেখানে কাক ডাকার আগে থেকেই গলার সাড়া পাওয়া যেত, তারপর যত বেলা বাড়ত ততই কলরব উঠত চতুর্দিকে। মাঝে মাঝে মনে হত হাট-বাজার বসেছে যেন। সারাদিন, দুপুর, বিকেল, সন্ধে—এমন কি রাত দুপুর পর্যন্ত কত গলা, কত রকম কাণ্ড। সংসার ছাড়াও পাড়াটা ছিল জমজমা। মাঝ রাতেও কিছু না কিছু কানে আসত। অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল সমস্তই। নিজের কাজকর্ম, বিশ্রাম, ঘুম—সবের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সেই অভ্যেস কি সহজে যায়? এখানে এসে পর্যন্ত দয়াময়ী সবই কেমন ফাঁকা অনুভব করেন। চুপচাপ, নিঝুম যেন চার পাশ। কথা বলার মানুষ নেই, সময় কাটে না, ছেলেমেয়ে বাড়িতে না থাকলে একা। পাশাপাশি বাড়ির একে ওকে তাই ডাকাডাকি করেন, কথাবার্তা বলেন। চা করে খাওয়ান। আবার এটা ওটা এনে দিতে বলেন ঘর থেকে, কাউকে বলেন একটা পান সেজে দিতে। সুনীলের বউ প্রতিমার সঙ্গে তাঁর একটু বেশি মেলামেশা। একেবারে কচি বউ, উনিশ বছর বয়েস মাত্র। বড় ছেলেমানুষ। বেশ

লাগে দয়াময়ীর। নিজেই আগ বাড়িয়ে এটাসেটা কুটে দেয়, পান সেজে আনে, তার বাপের বাড়ির গল্প বলে। দয়াময়ীরও বাপের বাড়ি ছিল ওরই কাছাকাছি। দয়াময়ীও এই রকম বয়েসে মল্লিকবাড়ির ছোট বউ হয়ে সেই প্রাসাদে ঢুকেছিলেন। আর ছেড়ে এলেন যখন তখন তিনি প্রবীণা, প্রাসাদ ভেঙে পড়েছে।

এ-সব কথাও তো কিছু কিছু বলতে ইচ্ছে করে। কাকে বলবেন?

প্রতিমাকে শোনান। আর শোনে মিত্তিরের মা। দয়াময়ীর একটা আলাদা মান-সম্মানও আছে পড়শীদের কাছে। হাজার হোক মল্লিকবাড়ির বউ।

কেতকী কখনো কখনো ঠাট্টা করে মাকে। 'তোমার সেই ধোপার গাধার মতন অবস্থা। পিঠের ওপর বোঝা না থাকলে ঘর চিনতে ভুল করো।'

বলুক মেয়ে যা বলার। তবু দয়াময়ী মুখ বুজে বাড়িতে বসে থাকতে পারবেন না।

কেতকী একলাই ছিল বাড়িতে, গান শুনছিল রেডিয়োয়।

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।

কেতকী ভেবেছিল মা। মা অবশ্য অত খুট খুট করে কড়া নাড়ে না।

সদরে গিয়ে দরজা খুলে দিল কেতকী। নীরজাবালা। মেজোজেঠি। চট করে চেনা যায় না।

"মেজো জেঠি?" কেতকী অবাক। "তুমি?"

নীরজা বললেন, "ছোটো কই?"

"মা এখানেই কোনো বাড়িতে গিয়েছে। এসো।" নীরজা ভেতরে এলেন। এমন ভাবে এসেছেন তিনি যেন চোর। একেবারে সাধারণ বেশ। মাথায় কাপড়, প্রায় কপাল পর্যন্ত টেনে দিয়েছেন। গায়ে সুতীর চাদর। যেন নিজের সর্বাঙ্গ আড়াল করে এসেছেন।

কেতকীর খুবই অবাক লাগছিল। এই প্রায় সন্ধেবেলায় একা তিনি দেড় দু মাইল এসেছেন? তাও এই নতুন জায়গায়? চিনলেন কেমন করে? নীরজা একা কোথাও বাইরে যান না বড় একটা। কেতকীর সন্দেহ হচ্ছিল।

"এত দূরে চলে এসেছিস তোরা। খোঁজ খবর রাখাই মুশকিল," নীরজা বললেন।

ঘরে এনে নীরজাকে বসাল কেতকী। "তুমি চিনলে কেমন করে?"

"ওদের মুখে শুনতাম।" ওরা যে কারা—তা বললেন না।

"একা এসেছ?"

"হ্যাঁ পৌঁছে দিয়ে গেছে।"

কেতকী বুঝতে পারল নীরজা অনেক কিছুই ভাঙতে চান না। মেজো জেঠির মুখ দেখলে আলোয়। শুকনো, থমথমে, দিশেহারা। ভীষণ চিন্তিত, উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। কেমন এক অসহায় ভাব।

"মাকে ডেকে আনি?"

"আন। দেরি হবে?"

"না না, এই তো কাছেই আছে মা। তুমি বসো। আমি ডেকে আনছি।"

কেতকী চলে যাচ্ছিল, নীরজা বললেন, "একটু জল খাওয়া, বড় তেষ্টা পেয়েছে।"

জল আনতে গেল কেতকী।

গায়ের চাদরটা খুলে ফেললেন নীরজা। গরম লাগছে। কপাল, মুখ মুছলেন আঁচলে। পাখা টাঙানো হয়নি এখনও। কেন, কে জানে।

কেতকী জল এনে দিল।

নীরজা মুখের ওপর গ্লাস তুলে আলগোছে জল খেলেন। এই ভাবেই জল খান তিনি।

"একটা পাখা দিবি?"

"দিচ্ছি।"

কেতকী পাখা এনে দিল। "আমি মাকে ডেকে আনছি, তুমি বসো।"

বাইরে এল কেতকী। মেজোজেঠি যে বিপদে পড়ে এতদূর ছুটে এসেছে—এটা বোঝাই যায়। কিন্তু কী বিপদ? শুধু বিপদ নয়, মেজোজেঠি নিশ্চয়ই লুকিয়ে এসেছে। কার সঙ্গে এল, কে পৌঁছে দিয়ে গেল কে জানে। তপু কী? মনে হয় না।

কেতকী বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকাল। মা কোথায় গিয়েছে? সুনীল-দার বাড়ি বোধ হয়।
খানিকটা এগুতেই মিতা বউদির সঙ্গে দেখা। "মা কোথায় বউদি?"
"মাসীমা! ওই তো, ও বাড়ি।" হাত দিয়ে বাড়ি দেখাল মিতা। "খুকুদের বাড়ি।"
"ও! আচ্ছা!...কোথায় গিয়েছিলে?"
"কোথাও নয়। সোনার সঙ্গে কথা বলছিলাম। বাড়ি ফিরছি।"
কেতকী ডান দিকের কোয়ার্টারের পথ ধরল।

ফেরার পথে দয়াময়ী বললেন, "মেজদি হঠাৎ?"
"কী জানি! আমায় কিছু বলল না।"
যতটা পারেন পা চালিয়ে আসছিলেন দয়াময়ী। "কোনো আপদ-বিপদ হয় নি তো?"
"তেমন কিছু হয় নি। হলে বলত।"
কেতকীর মাথায় ওই একই সন্দেহ। পদ্মা! পদ্মাকে নিয়েই হয়েছে কিছু। তা যদি হয়—এখানে কেন?
ঝিলের গা ধরে অন্ধকার যেন গড়িয়ে এল। গাড়ি যাচ্ছে। মাঠ ঘাট কাঁপছিল। শেষ দুপুরের মেল এত দেরি করে যাচ্ছে।
বাড়ির কাছাকাছি এসে কেতকী বলল, "এতটা পথ বেয়ে এসেছে। দেখো কী বলে?"
দয়াময়ী কিছু বললেন না।
বাড়ি পৌঁছে দয়াময়ী ভেতরে ঢুকলেন, কেতকী সদরে দাঁড়িয়ে থাকল। পদ্মার জন্যেই যদি মেজোজেঠি এসে থাকে—কেন এসেছে? কিছুই করার নেই কেতকীদের। কিন্তু তাই বা কেন আসবে জেঠি?
ঢুকব কি ঢুকব না করে কেতকী ভেতরে ঢুকল।
উঠোনে পা দিতেই কানে গেল, মোজোজেঠি কাঁদছে। একেবারে নিঃশব্দে নয়, ফোঁপানো কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

দাঁড়িয়ে পড়ল কেতকী। পাথরের মতন।

দয়াময়ীর গলা শোনা গেল, "মেজদি!"

নীরজার গলা তখনও কান্নায় বুজে আছে। ফোঁপানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ভাল লাগছিল না কেতকীর। ভয়ের মতন লাগছিল। তার কী করা উচিত বুঝতে পারছিল না। ভেতরে যাবে, না বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে?

নীরজার কান্না শেষ পর্যন্ত থামল। "তোর কাছে আমি পাগলের মতন ছুটে এসেছি, ছোটো। আমার সর্বনাশ হয়েছে।" মেজোজেঠির গলা কান্নায় জড়ানো, ভাঙা-ভাঙা মোটা শোনাল।

দয়াময়ী বললেন, "এসেছ তো কী হয়েছে! তুমি একটু শান্ত হও তো!"

"আমার শান্তি শ্মশানের চিতেয় যখন পুড়ব, তার আগে না।···আজ দু দিন জলস্পর্শ করতে পারি নি। আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, কেমন করছে।"

দয়াময়ী বললেন, "ও-সব কথা থাক। পরে হবে। তুমি একটু হাতে মুখে জল দিয়ে বসো তো আগে। সুস্থির হও। পরে সব শুনব।"

কেতকী দাঁড়িয়ে থাকল। চোখ ঘরের দিকে।

"ওঠো," দয়াময়ীর গলা।

নীরজাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এলেন দয়াময়ী। দেখলেন কেতকীকে। নীরজারও চোখ পড়ল কেতকীর ওপর।

"ওই যে কলঘর। চোখে মুখে জল দাও আগে। ঠাণ্ডা হও।" দয়াময়ী নীরজাকে কলঘরের দিকে ঠেলে দিলেন। মেয়েকে বললেন, "জেঠির জন্যে চা কর।"

কেতকী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

মল্লিক বাড়িতে অনেক রকম মানুষ দেখেছে কেতকী। মেজোজেঠিকে তাদের সঙ্গে অনেক জায়গায় মেলানো যায় না। অন্যরা এক এক সময় এক এক রকম। যখন সুসময় ছিল তখন তাদের দেমাকে মাটি ফাটত, ছিনিমিনি খেলা চলত টাকা-পয়সা নিয়ে, কার হাত কত লম্বা তার রেষারেষিও

চলত। দুঃসময় যখন এল, তখনও চৈতন্যহীন। আর যখন সব গেল তখন মাথা চাপড়ানো, কান্নাকাটি নোংরামি। কেতকী নিজের চোখে সব দেখে নি, শুনেছে। নিজে দেখেছে পড়ন্ত বেলার চেহারাটা ; তার পর যা নিত্য দেখেছে—সে-হল অন্ধকারে ইঁদুরের মতন ছুটোছুটি। মেজোজেঠি এর বাইরে নয়, তবু তার দেমাক সে চলতে-ফিরতে মানুষকে বুঝিয়ে দিত না। বড় জেঠির মতন রূপ ছিল না মেজোজেঠির, লাবণ্য ছিল। খানিকটা হিসেবীও ছিল, কিছু রাখতে পেরেছিল। দুর্দিনে নিজের স্বামী সন্তানদের মাথায় সে ছাতা ধরেও রেখেছিল। তবে মেজোজেঠি অন্য অনেক ব্যাপারে বোকা, অসাবধানী ছিল। তার ফলও ভুগেছে। ভুগছে এখনও। তবু, সব মিলিয়ে মেজোজেঠি অতটা অসহ্য নয়, যতটা বড় আর সেজোজেঠি। তা বলে কেতকীর যে মায়া রয়েছে মেজোজেঠির ওপর তা নয়। অন্যদের মতন সে মেজোজেঠিকেও ঘৃণা করে। অন্যদের সঙ্গে তফাতটা উনিশ-বিশের।

চা সুজি নিয়ে কেতকী উঠল।

ঘরে আসতেই নীরজা বললেন, "তোর কাছে একটা ভিক্ষে চাইব। না বলতে পারবি না।"

কেতকী কিছুই বুঝতে পারল না।

দয়াময়ী কেমন গম্ভীর, বিহ্বল হয়ে বসে ছিলেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোনো দিশে করতে পারছেন না।

"আগে তুমি চা খাও, মেজদি," দয়াময়ী বললেন। বোধ হয় ভিক্ষের বহর বুঝে তাঁর ভয় ও অস্বস্তি হচ্ছিল।

"না ; কেতু আমায় বলুক আগে," মেজোজেঠি ঘাড় নাড়লেন।

কেতকী কয়েক মুহূর্ত নীরজার দিকে তাকিয়ে থাকল। এমন উৎকণ্ঠ প্রত্যাশা সে বোধ হয় আর কখনও দেখে নি মেজোজেঠির মুখে।

"তুমি চা-টা খাও না", কেতকী বলল।

"না, আমার গলায় ঢুকবে না ; কাঁটা ফুটে আছে।" নীরজার ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিল।

"বেশ তো বলো," কেতকী তাকিয়ে থাকল।

নীরজা ভিক্ষে চাওয়ার মতন দু-হাত, মুখ বাড়িয়ে দিলেন কেতকীর দিকে। "তোরা ক'টা দিন পদ্মাকে এ-বাড়িতে একটু জায়গা দে।"

কেতকী চমকে উঠল। তার সন্দেহ ঠিক ; পদ্মার জন্যেই এসেছে মেজো-জেঠি। কিন্তু সে কল্পনা করতে পারে নি, এখানে পদ্মাকে রাখার কথা উঠতে পারে।

নীরজা করুণ, কাঙাল-কাঙাল মুখ করে তাকিয়ে আছেন ; চোখের পলক পড়ছে না।

কেতকী মুখ ফসকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, সামলে নিল। সে কী শুনেছে না-শুনেছে বলা যায় না এখানে। মাকেও সে বলে নি কিছু। বলতে ইচ্ছে করে নি। তা ছাড়া কেতকী কেমন করে বলবে, তপুর কাছে শুনেছে। কথাটা নোংরা। মেয়েলী কথা। তপু ও-বাড়ির নোংরা, মেয়েলী কথার খবর দিয়ে যায় কেতকীকে—এটা মাকে জানানো যায় না।

কেতকী নিজেকে সামলে নিল। অবাক হবার ভান করে বলল, "কেন কী হয়েছে পদ্মার?"

নীরজা কাঁদলেন না, নিজের কপাল দেখালেন। "যা হয়েছে আমার মুখে আসবে না। ছোটোকে বলেছি। ওর কাছে শুনিস। তুই আমার এই উপকারটুকু কর, কেতু। তুই আমার মেয়ে, তোর পায়ে ধরছি।"

কেতকী একবার মার মুখ দেখল। মা একেবারে স্থির। কী করবে, কী বলবে বুঝতে পারছে না।

নীরজার দিকে তাকাল কেতকী। "পদ্মাকে তুমি কেন রেখে যেতে চাইছ? হয়েছে কী?"

"ছোটো তোকে সব বলবে। আমার মাথায় বাজ পড়েছে, কেতু। এই উপকারটুকু কর। আমার আর-কেউ নেই যাকে বলব। তোদের কাছে ছুটতে ছুটতে এসেছি।"

কেতকী এবার শক্ত হল। "ক'দিন ওকে এখানে রেখে তোমার কী হবে?"

"তুই রাখ, মা। ক'দিন রাখ। পরের ব্যবস্থা আমি করব।"

"কী করেছে পদ্মা?"

"পাপের কথা আমার মুখ থেকে শুনবি! বেশ শোন, হারামজাদীর পেটে বাচ্চা এসেছে।"
কেতকী যেন আকাশ থেকে পড়ছে এমন ভান করল চমকে ওঠার। চোখ মুখ লাল হল। কথাটা যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না—বলল, "কী বলছ তুমি? পাগল হয়ে গিয়েছ?"
"মা হয়ে মেয়ের নামে মিথ্যে বলব!"
মুখ নীচু করে নিল কেতকী। সামান্য পরে মুখ তুলল। নীরজা আবার কাঁদছেন।
কেতকী বলল, "না, মেজোজেঠি," মাথা নাড়ল। "এখানে ওকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। এই তো ক'টা রেল কোয়ার্টার। সবাই সবার খবর নেয়। লোকে জেনে যাবে। আমাদের ক্ষতি হবে। আমরা পারব না।"
নীরজা কাঁদছিলেন।
দয়াময়ী বললেন, "মেজদি, তুমি এই সর্বনাশ ক'দিন লুকিয়ে রাখবে?"
কোনো জবাব নেই। কান্না থামালেন নীরজা, চোখ মুছলেন আঁচলে। বললেন, "পনেরো বিশটা দিন তোরা রাখতে রাজী হলি না। কেউ কিছু জানত না। সবাই কি মেয়ের মা। যাক্, আমার ভুল হয়েছিল। ছুটতে ছুটতে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম, তোরা এত দূরে আছিস—আলাদা থাকিস, হয়ত রাখতে রাজী হবি। ও-বাড়িতে মেয়েটাকে আর রাখতে পারছি না, ঘেয়ো বাঘ, সবাই খোঁচাচ্ছে। দু দিন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে গিয়েছিল। তা তাই যাক। মরুক। ও বাঁচুক। আমি বাঁচি।"
নীরজা আর কাঁদলেন না।
দয়াময়ী চুপ। কেতকীও মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে। ঘরটা এতক্ষণ যেন নাটকের দৃশ্যের মতন হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ সব ভেঙে গিয়েছে। কোনো সাড়াশব্দ নেই, থমথম করছে।
আচমকা নীরজা উঠে দাঁড়ালেন। "আমি যাই ছোটো।"
দয়াময়ী অবাক। "তুমি চা-ও খাবে না, মেজদি?"
"না।" নীরজা হাত বাড়িয়ে চাদর তুলে নিলেন।

"মেজদি, আমার বাড়িতে আজ প্রথম পা দিলে, এই ভাবে চলে যাবে?"
নীরজার সেই কাতর, করুণ চোখমুখ কেমন কঠিন, রুক্ষ, জেদীর মতন হয়ে উঠেছিল। কথার জবাব না দিয়ে গায়ে চাদর জড়ালেন নীরজা।
কেতকী মেজোজেঠিকে দেখছিল। মেজোজেঠির এই চেহারা তার আরও ছু এক বার দেখা আছে। মানুষ বোধ হয় সব আশা-ভরসার বাইরে এসে পড়লে এই রকমই কঠিন জেদী হয়ে ওঠে। মেজোজেঠির ভেতরে যে অহঙ্কার কখনো সখনো দপ্ করে জ্বলে উঠত, সেই অহঙ্কারই কি জ্বলে উঠল।
"তুমি একলা একলা যাবে নাকি?" কেতকী বলল।
নীরজা তাকালেন কেতকীর দিকে। "দেখি!"
ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নীরজা। দয়াময়ী বিমূঢ়। তিনিও বাইরে এলেন। পেছনে কেতকী।
"মেজদি, রাত হয়েছে। অন্ধকার। তুমি এ-ভাবে যেও না।"
নীরজা বললেন, "আমার আবার অন্ধকার কী ছোটো। বুড়ি মানুষ। আমি চলে যাব।"
কেতকীর অস্বস্তি হচ্ছিল। এই অন্ধকারে একটা মানুষ, যার কোনো কিছু চেনা নেই, যে একা বাড়ির বাইরে যায় না—সে যাবে কেমন করে?
"তুমি এখানে রিকশা পাবে না মেজোজেঠি," কেতকী বলল, "বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যদি রিকশা না পাও···।
"পেয়ে যাব। আসতে বলেছিলাম।"
"একা দাঁড়িয়ে থাকবে?"
"আসি ছোটো। কেতু আসি।" নীরজা উঠোন দিয়ে সদরে চলে গেলেন।
কেতকীর মনে হল, এটা অন্যায় হচ্ছে। এ-ভাবে মেজোজেঠিকে যেতে দেওয়া উচিত নয়।
"মা, আমার টর্চটা এনে দাও তো, এগিয়ে দিয়ে আসি।"
দয়াময়ী টর্চ আনতে ঘরে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন কেতকী নেই। সদরে এসে দাঁড়াতেই আবছা চোখে পড়ল, কেতকী যেন তার মেজো-

জেঠিকে দাঁড় করাবার জন্যে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। টর্চ জ্বেলে ডাকতে গেলেন, আলো জ্বলল না।

চায়ের দোকানে কাউকে পেল না মৃগেন। শতদল নেই, জোছন নেই। এমন কি পানুও নয়। কোথায় গেল? নীলেন্দুর কাছে? আজ ওখানে যাবার কথা নয়। সিনেমায় চলে গেল? মৃগেনকে ফেলে রেখে ওরা সিনেমাতেও যাবে না।

মৃগেনের মনে হল, বাড়িতে বসে দু জনে নিশ্চয় দাবা খেলছে। যেমন শতো, তেমনি জোছন; দাবা নিয়ে বসলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে যায়। এই এক বাজে নেশায় ধরেছে ওদের। বিরক্ত হল মৃগেন। আবার সাইকেল ঠেঙিয়ে শতদলদের বাড়ি ছোট।

দোকানে আর উঠল না মৃগেন, সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে নিল।

দোলের দিন এগিয়ে এসেছে। এই শহরে ফাগুয়ার জোর হই-হুল্লোড় চলে। বাঙালী বিহারী দুই মহলেই। আশ্রমে উৎসব হয়, গিরিবাবুর বাগানে গান-বাজনা, আর হোলির হুল্লোড় তো আছেই। মৃগেন যেতে যেতে কয়েক জায়গাতেই ঢোল আর করতালের আওয়াজ শুনল, বিহারী মহল্লায় হোলির গান শুরু হয়ে গিয়েছে। একটা কথা মৃগেনের খুব মনে পড়ে, মনে পড়লেই হাসি পায়। একবার হোলির দিন সিদ্ধি খেয়ে মৃগেন এমনই হয়ে গিয়েছিল যে, জোছনরা তাকে গাধার পিঠে চাপিয়ে হুল্লোড় করছে, সে-খেয়ালও তার ছিল না। ছেলেমানুষির এই সব মজার দিন কবে ফুরিয়ে গিয়েছে। হাত বাড়িয়েও আর ধরা যায় না। মাঝে মাঝে মনে পড়ে, হাসি পায়, আর নিশ্বাস পড়ে। সুখ, আনন্দ, ভাল লাগা—সব যেন চলে গেল জীবন থেকে। অথচ কী বয়েস তাদের, বাইশ চব্বিশ ছাব্বিশ। এই বয়েসে এত যায়! কে জানে!

শতদল বাড়িতেই ছিল। বিছানায় শুয়ে আছে। কাগজ, কলম বিছানায় ছড়ানো। ছাদমুখো হয়ে শুয়ে ছিল হাত-পা ছড়িয়ে।

"কিরে ?" মৃগেন ঘরে ঢুকে বলল।

শতদল যেমন ছিল সেই ভাবেই শুয়ে থাকল। কোনো কথাই বলল না।

মৃগেন বলল, "আমি ভেবেছিলাম তোরা দাবায় মেতে আছিস! শ্রীপদর দোকান থেকে ফিরে এলাম। জোছন আসে নি ?"

"না।"

"সন্ধেবেলায় শুয়ে শুয়ে ছাদ দেখছিস ?"

"ভাবছি।"

মৃগেন বসল চেয়ারে। "কী ভাবছিস ? অত কাগজ ছড়িয়ে রেখেছিস কেন ?"

শতদল প্রথমে কোনো জবাব দিল না কথার। পরে বলল, "আমার স্টমাক লুজ। হেভি ম্যাংগো হয়েছে। চেঁচিয়ে কথা বলতে পারব না। কাছে আয়।"

মৃগেন হেসে উঠল জোরে। "তাই বল। তা কাগজ নিয়ে কী করছিস ?"

"একটা প্ল্যানিং করছিলাম।"

মৃগেন চেয়ারটা এগিয়ে নিল।

শতদল বলল, "বাবার সঙ্গে তর্ক হল। বাবা বলছে, আমার দ্বারা কিস্যু হবে না। আমি অপদার্থ। মা বলল, হবে না কেন—আড্ডা-মশকরা আর কাপ্তেনী হবে। ব্যাপারটা বুঝছিস তো, ভীষণ ইনসালটিং। আমি সোজা বলে দিলাম, চাকরি-বাকরি আমি করব না। হবে না আমার দ্বারা। পরের গোলামী আমার কোষ্ঠিতে নেই। আমি বিজনেস করব। বাবা মাইরি হেসেই খুন, এমন একটা স্ল্যাং ঝাড়ল—কোমরে নেই কষি কাঁধে তোলে অসি। বলল, তাই কর—আলু বেগুন নিয়ে বোস গে যা বাজারে, তাতেও একটা কাজ হবে।

মৃগেন হাসছিল। চাকরির ব্যাপারে শতদল সত্যিই যেন কেমন, গা নেই। নয়ত ও তো চাকরি পেয়েছে, বার দুই। মাস দুইও একনাগাড়ে করে নি।

শতদল বলল, "আমি বাবার চ্যালেঞ্জও অ্যাকসেপ্ট 'করেছি। বিজনেস

করব।”
“আলু পটলের?” মৃগেন হাসল। তার পকেটে সিগারেট আছে গোটা চারেক। বার করল। “নে।”
শতদল কাত হয়ে শুয়ে সিগারেট নিল। “না, আমি বেটা সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। আলু পটলের ব্যবসা করব কেন! একটা কারখানা খুলব। ছোট কারখানা। কেমিকেলসের। ভাবছি কোল বাই-প্রোডাক্টস তৈরি করব। টার, ফিনাইল, নেপথলিন, বেনজিন্ করলে কেমন হয়।”
মৃগেন সিগারেট ধরাল, আগুন দিল শতদলকে। বলল, “টাকা পাবি কোথায়?”
“টাকা! বাবা দেবে। বাবা যদি না দেয়, আমার মার গয়নাগাটি আছে। আমার প্রাপ্য। ঝেড়ে দেব।”
মৃগেন হাসতে লাগল।
শতদল এবার উঠে বসল বিছানায়। বলল, “হাসিস না। হাসার কিছু নেই। তোরা কিছু করার কথা ভাবলে চাকরি ছাড়া ভাবতে পারিস না। বাঙালী মানেই চাকরি। বিজনেস কেন করব না। তোর ঠাকুরদার কথা ভেবে দেখ। লোকে বলে এদিকের প্রথম বাঙালী কোলিয়ারী মালিক। কচ্ছি আর মাড়োয়ারীদের হালুয়া করে দিয়েছিলেন তোর ঠাকুরদা। তা হলে?”
মৃগেন কিছু বলল না। হাসিমুখে চেয়ে থাকল। ঠাকুরদাকে সে দেখে নি, কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের কথা শুনেছে।
শতদল বলল, “আমি সিরিআসলি ভাবছি প্ল্যানটা। তোকে পার্টনার করব। তোরও তো কিছু হবে না। আমার সঙ্গে লেগে থাক বেটা। তোকে ম্যানেজার করব।”
মৃগেন হাসতে হাসতে বলল, “আমায় ক্যাশ হ্যাণ্ডেল করতে দিতে হবে।”
দুজনেই হেসে উঠল।
সামান্য পরে শতদল বলল, “নারে মৃগু, এ-ভাবে আর ভাল লাগে না। সবাই আমাদের ওয়ার্থলেস ভাবে। বুড়ো দামড়া হয়ে যাচ্ছি। একটা কিছু করা দরকার। তোর মন খারাপ হয় না?”

মৃগেন বিছানার ওপর ছড়ানো কাগজ-পত্রের দিকে তাকিয়ে থাকল। মাথা নাড়ল আস্তে। হয়, মন খারাপ হয় বইকি। কেন হবে না।

শতদল বলল, "আমি তামাসা করছি না। অনেক দিন ধরেই মাথায় এটা ঘুরছে। বলেছি তোদের। সত্যিই ব্যবসাপত্রে নামব। তোকে নেব। তোর ব্লাডে বিজনেস আছে।"

মৃগেন এবার আবার হাসল। "আমার ব্লাডে ব্যবসা কেমন করে থাকবে রে! ঠাকুরদার ব্যবসা জেঠা-বাবা কেমন করে উড়িয়ে দিল দেখলি না? আর আমার বাবা ব্যবসার 'ব'-ও বুঝত না। আমি কী বুঝব।"

"ব্লাডের মাঝে মাঝে কমা-বাড়া হয়; জোয়ার ভাটা। ও-সব কিছু না।··· তোকে নিয়েই করব। পার্টনার অ্যাণ্ড ম্যানেজার। হাত মিলাও বেটা।"

জোছনের গলা পাওয়া গেল বাইরে।

শতদল বলল, "শালা এসেছে।"

জোছন ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে বলল, "গুরু, তুমি নাকি লিক্ করছ?"

"কে বলল?"

"বাঁশি। দেখা হল। বলল, তোমার আজ লিক্ হচ্ছে। খাও শালা, কাল দু টাকার কচুরি ওড়ালে। উইথ্ দই বড়া। বললাম, মরবে। শুনলে না। ঠেলা বোঝ। তুমি কাঁচকলা খাওয়ার পার্টি, তোমার ওই সব রাজসিক ব্যাপার হজম হবে কেন!"

শতদল গম্ভীর মুখে বলল, "তুমি বেটা ডায়েরিয়া আর ডিসেনট্রির তফাত বোঝ না। লিক্ রিলেটেড্ টু ডায়েরিয়া, আর টেনডেন্সি অফ লিকিং উইথ পেট মোচড় অ্যাণ্ড ম্যাংগো ইজ ডিসেনট্রি।"

জোছন লাফ মেরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে দু হাতে তালি বাজাল। "সাবাস গুরু। এই জন্যেই তোমায় গুরুপদে বরণ করেছি। তুমি সাঁইবাবার চেয়েও পপুলার হতে পার, কী মার্ভেলাস বাণী তোমার।"

সারা ঘরে হাসির হল্লা উঠল।

জোছন শতদলের বিছানায় বসল। "এত কাগজ কিসের রে?"

"বিজনেস।" মৃগেন বলল, "তোর গুরু বিজনেসের প্ল্যানিং করছিল।"

জোছন কেমন আঁতকে ওঠার ভান করে দুটো কাগজ তুলে নিল। দেখল।
"এ-সব কী রে?"
"তুই বুঝবি না। রেখে দে।"
জোছন বলল, "রিয়েলি বিজনেস?"
"হ্যাঁ।"
"কে কে আছে?"
"আমি আর মৃগু।"
জোছন মজার চোখ করে মৃগেনকে দেখল। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকাল শতদলের দিকে। "আমায় নিবি না?"
"না। তুমি এলে ব্যবসা ডকে উঠবে।"
জোছন থ' হয়ে যাবার ভাব করল। বলল, "তার মানে! আমাকে তোমরা ডকের এজেন্ট ভাবছ! কারণটা কী গুরু?"
"তোমার দ্বারা হবে না," শতদল গম্ভীর ভাবে বলল, "তোমার মধ্যে বিজনেস কোয়ালিটি নেই। তুমি হলে অপব্যায়ী, দু পয়সা পেলে পাঁচ পয়সা ওড়াও। তোমার মাথা গরম, তোমার মধ্যে ধৈর্য নেই। তুমি শালা পার্টির সঙ্গে হাতাহাতি করবে। অ্যানাদার পয়েন্ট, তুমি সরকারী পয়সা পকেটে পুরতে শিখেছ উইদাউট এনি ওয়ার্ক। খাটা খাটুনি তোমার পোষাবে না।....তুমি বাদ।"
মৃগেন হাসছিল।
জোছন বলল, "গুরু, বেশি পিঁয়াজী ঝেড়ো না। তোমরা করবে ব্যবসা। আণ্ডা করবে। হোটেল ফাদারে আছ, ভাবছ সাইনবোর্ড বসালেই ব্যবসা হয়। করে দেখো ব্যবসা, গণেশ উলটে পালিয়ে আসতে হবে।"
মৃগেন ঠাট্টা করে বলল, "গণেশ না উলটোলে ব্যবসা হয় না, জোছন।"
"ওলটাও ভাই, তোমাদের গণেশ, তোমরা ওলটাও। আমি নেই।" বলে জোছন কাগজগুলোকে সরিয়ে দিয়ে পা তুলে বসল বিছানায়। বসে সিগারেটের প্যাকেট বার করল।
শতদল বলল, "আর-একটা পয়েন্ট আমি বলিনি, জোছন।"

"বলে ফেলো।"

"তুমি বিয়ে করছ! তোমার জন্যে মেয়ে দেখা হচ্ছে!" শতদল যেন হেসে হেসে হাতের শেষ তাস বার করল।

জোছন অবাক। "বিয়ে! আমার? কে বলল?"

"খবর আছে," শতদল বলল, "ফ্রম হর্সেস মাউথ্‌।"

"বাজে বকিস না। আমার বিয়ে। কোনো বাপের এমন মাথা খারাপ হয় নি আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে। কেন গুল ঝাড়ছিস!"

"তুমি বেটা কার কাছে কথা চাপছ। আমি তোমার হাঁড়ির খবর রাখি। এই মৃগু, বাইরে গিয়ে বাঁশিকে একবার ডাক তো।"

জোছন বোকার মতন বলল, "তার মানে?"

"নিজের কানেই শোনো।...যা না মৃগু, ডাক না।"

মৃগেনের হাসি পাচ্ছিল, কৌতূহলও হচ্ছিল। সে উঠল।

জোছন বলল, "চ্যাঙড়ামি করিস না, শতো। এখানে বাঁশি আসছে কেন?"

"কেন আসছে দেখতেই পাবে।" শতদল মৃগেনের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল।

মৃগেন বাইরে গেল।

জোছন রীতিমত বিমূঢ়। "তুই বড় বাড়াবাড়ি করছিস, শতো।"

শতদল হাসছিল মুখ টিপে। "আমি, কিছু করছি না ভাই, যাঁরা করার তাঁরা করছেন। তোমার এখন সুখের দিন। পাখা গজাচ্ছে।"

বাইরে মৃগেন বাঁশরীকে ডাকছিল চেঁচিয়ে। ফিরে এল।

"আসছে।" মৃগেন বলল।

জোছন বলল, "আমাকে তোরা খেপাচ্ছিস। ও. কে। দেখছি তোদের।"

একটু পরেই বাঁশরী এল।

শতদল বলল, "বাঁশি সত্যি কথা বলবি। কাল জেঠাইমা এ-বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন না মার কাছে?"

বাঁশরী মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ, কেন?"

"মার কাছে জেঠাইমা বলেন নি, জোছনের বিয়ের জন্যে মেয়ে খুঁজছেন?"

এবার বুঝতে পারল বাঁশরী। বুঝে হেসে ফেলল। "হ্যাঁ। জেঠাইমা তো বলছিলেন। আমি মা'র কাছে ছিলাম। নিজের কানে শুনেছি! কোন্ একটা মেয়ের কথা বললেন, আসানসোলে থাকে।"
শতদল বলল, "ব্যাস!...থ্যাংক ইউ।...এবার তুই আয়। একটু চা-ফা পাঠা।"
বাঁশরী হাসছিল। জোছনকে বলল, "তোমার বউ নাকি নাচতে পারে, জোছনদা।"
জোছন ধমক দেবার গলা করে বলল, "ফাজলামি করিস না, বাঁশি। আমি তোর দাদা। কেটে পড়। বড্ড ফাজিল হয়ে গিয়েছিস তোরা।"
বাঁশরী জিভ বার করে ভেঙচাল। তারপর হাসতে হাসতে পালাল।
মৃগেন জোরে হেসে উঠল।
শতদল বলল, "কি জোছনবাবু! এবার?"
জোছন বলল, "আমি কিছু জানি না। বিশ্বাস কর। মা-বাবা যদি মনে মনে কিছু ভেবে থাকে—আমার জানার কথা নয়। কিন্তু বিয়ে মা-বাবা করবে না। আমি করব। আমি বিয়ে করতে রাজী নই। কখনো না।"
"কেন? তোমার শালা নতুন লাইফ্ হবে।"
"নিকুচি করেছে তোর নতুন লাইফে।...বিয়ে-ফিয়ের মধ্যে আমি নেই। ভদ্দরলোকে বিয়ে করে। আমার দাদাকে দেখছি না, বউয়ের ফরমাশ খেটে খেটে মরছে। মাপ করো রাজা, ও শালা সেন্টের গন্ধ, সিঁদুরের দাগ, মিঠে পান মুখে দিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়া—ও-সব আমার পোষাবে না।"
"বুঝেছি, তুমি বেটা ধর্মের ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়াবে।"
"তোমরা কোথাকার ষাঁড়, চাঁদু!"
"আমরা বেকার। তুমি চাকরি করো। বিয়ের বাজারে তুমি কোয়ালিফায়েড পাত্র। আমরা নই। বিজনেসটা লেগে যাক, তারপর হব।"
মৃগেন তামাশা করে বলল, "এখন যদি তুই বিয়ে করিস জোছন, ততদিনে ছেলের বাপ হয়ে যাবি।"
"থাম। আর ভাল লাগছে না," জোছন হাত উঠিয়ে বলল, "মেয়েফেয়ের

ব্যাপার আমার ভাল লাগে না। আমি অ্যান্টি-ম্যারেজ। তোদের সব ব্যাপারটাই হল যা চলছে চলতে দাও। স্কুল, কলেজ, চাকরি, বিয়ে, বউ নিয়ে নাচানাচি, ছেলেপুলে, তারপর সংসার করতে করতে বুড়ো। শেষে চিতায় ওঠো। দূর, এই কি জীবন?"

শতদল বলল, "দেখ জোছন, এবার তুই পিঁয়াজি ঝাড়ছিস। যা যা বললি এর সবই তোকে করতে হবে।"

"করব না। নেভার।"

"কী করবি তুই?" মৃগেন বলল, "বিয়ে না হয় নাই করলি।"

জোছন কথার জবাব দিল না। মৃগেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। পরে বলল, "জানি না। আমার এ-সব ভাল লাগে না। একদিন কিছু করে ফেলতেও পারি।"

"কিছুটা কী? সন্নেসী হবি?" শতদল ঠাট্টা করে বলল।

"কেমন করে বলব। তোদের ভাল লাগে এই সব?"

মৃগেন বলল, "লাগে না। কিন্তু এ-ছাড়া অন্য কী করার আছে?"

জোছন শূন্য চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ পরে বলল, "কিছু নেই বলেই তো বিশ্রী লাগে। থার্ড ক্লাস। বোরিং। নীলুর কেন লাগছে! ও সত্যি সত্যি গানের টিউশানি ছেড়ে দিচ্ছে?"

শতদল বলল, "ভুল করছে। মাসীমার এখন কী অবস্থা হবে?"

জোছন স্বীকার করল কথাটা। বলল, "হ্যাঁ, ভুল করেছে। কিন্তু একটা কথা তো ঠিকই—নীলু পয়সা কামাবার জন্যে যা তার ভাল লাগে না, যা সে পারে না—তা করতে রাজী নয়।"

মৃগেন বলল, "তুই এমন কথা বলছিস যেন যা ভাল লাগে সেটাই করা উচিত। মিনিংলেস কথা। আমাদের কি কোনো পছন্দ আছে যে এটা ভাল লাগে না বলে ওটা করব। তোর তো চাকরি করতে ভাল লাগে না, করছিস কেন।"

মাথা নাড়ল জোছন। "ঠিক। সেই পুরনো কথা তুলছিস তুই। আমিও ওটা বলি।...হ্যাঁ ভাল লাগে তবু করছি। কেন না, টাকা পাচ্ছি। পেটের

জন্যে করছি। আজ যদি বাবা-মা আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়—কাল ওই পয়সায় পেট চালাতে হবে। কিন্তু ধর, আমার যদি এমন একটা কাজ জুটত—যা আমার করতে ভাল লাগে, আমি শালা বলতাম তোদের। শতো ছু ছুবার কাজ ছাড়ল কেন? ওর ভাল লাগত না বলেই না! তবে?"

শতদল বলল, "নে, এ-সব লেকচার ছাড়। হেভি হয়ে যাচ্ছে। ভাল লাগছে না—ভাল লাগছে না করে চেঁচিয়ে কোনো ফায়দা নেই। এটা একটা ডিজিজের মতন হয়ে গিয়েছে আমাদের। এর পর তোরা ভাল না লাগার জন্যে চল্লুতে টার্ন করবি, সীতুর মতন।"

জোছন লাফিয়ে উঠল। "সীতুর মতন চল্লু? নো, নেভার।"

শতদল চোখ টিপে বলল, "ট্রাই করে দেখ না।"

"তুই দেখ।"

মৃগেন হঠাৎ বলল, "একটা কথা। বলা উচিত নয়, তবু বলছি। সীতু একটা চিঠি দিয়েছে নীলুকে। দেখেছিস?"

"না।" জোছন আর শতদল একসঙ্গে বলল।

বাঁশরী এল। দু কাপ চা এনেছে। মৃগেনদের দিল। শতদলকে বলল, "মা তোমায় চা খেতে বারণ করছে। সরবত খাবে?"

"সরবত! তাই দে! বেশি লেবু দিস না।"

বাঁশরী চলে গেল। যাবার আগে মৃগেনকে যেন চোখের ইশারায় বলে গেল কিছু।

জোছন বলল, "সীতু চিঠি লিখেছে, নীলু তো কিছু বলে নি।...কী লিখেছে?"

মৃগেন বলল কথাগুলো।

জোছনরা মন দিয়ে শুনছিল। কোনো কথা বলল না কিছুক্ষণ। চুপচাপ। জানলার ওপাশে বাতাবি লেবুর গাছে দমকা হাওয়া লেগে পাতার শব্দ হল, যেন বৃষ্টি নামল। টিকটিকি ডেকে উঠল ঘরে। পাখাটা হু হু করে চলছে।

জোছন বলল, "সীতু এখন ধম্মপুত্তুর সাজার চেষ্টা করছে নাকি?"
শতদল বলল, "লোকে ওর নামে বদনাম রটাচ্ছে মানে? ও চল্লু খায় নি? হাসপাতালে ছিল না?"
"আমি ভাই জানি না," মৃগেন বলল, "চিঠিতে যা লিখেছে বললাম।"
চায়ে চুমুক দিল জোছন। "নীলুর কাছে ও নিশ্চয় যাবে।"
"যেতে পারে। আমরা ক'দিন যাই নি। নীলু ভাল আছে। সীতু হয়ত গিয়েছে এর মধ্যে।"
"কাল একবার যাস তো মৃগু নীলুর কাছে। ব্যাপারটা জেনে আসিস।"
মৃগেন বলল, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সীতু নীলুর বাড়িতে যাবে না। মাসীমা বাড়িতে থাকেন সারাদিন।"
শতদল কিছু ভাবছিল। বলল, "সীতুকে একদিন দেখেছি। খুব খারাপ চেহারা হয়ে গিয়েছে। দাড়ি রাখছে শালা।"
"কবরেজী মোদক মারলে আবার কী হবে।" জোছন বলল, "ভেতরে ভেতরে একটা কিছু করছে।"
শতদল মাথার চুল ঘাঁটল। দেখল বন্ধুদের। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। অথচ তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে কিছু বলতে চায়।
মৃগেন বলল, "নীলু খুব নরম ধাতের। সে নিজেও না সীতুর কাছে চলে যায়।"
"আরও হপ্তা খানেক ঝোল-ভাত খাক, তারপর। কুইনিন গিলে নীলের মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। একটা ব্যাপার কিন্তু ঠিক। পানু শালা ইনফরমার। আমাদের কথাবার্তা সীতুকে গিয়ে বলে।" জোছন চা শেষ করে কাপ মাটিতে নামিয়ে রাখল।
শতদল বলল, "সীতু যদি বিষ খায় আরও কেচ্ছা হবে।"
"রাখ তো," জোছন খেঁকিয়ে উঠল, "বিষ খাওয়া অত সোজা? ওসব থিয়েটার সিনেমায় হয়। খাক না শালা বিষ। সে কারেজ ওর আছে? বড় বড় বাত।"
শতদল হঠাৎ বিরক্ত হল। বলল, "জোছন, তুই সবজান্তা নোস। অত

জোর করে কিছু বলিস না। তেমন হলে সীতুও বিষ খেতে পারে।"
আরও খানিকটা বসে মৃগেন উঠল। বলল, "আমায় একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। চলি রে।"
জোছনও উঠে পড়ল। বলল, "চল, আমিও যাব।"
"তুই কেন যাবি, বোস না," শতদল বলল।
"যাই, একটু ঘুরে আসি।"
বেরিয়ে পড়ল দু' জনেই। মৃগেন সাইকেলে উঠল না। পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দু' জনে।
তেঁতুলতলা পেরিয়ে এসে জোছন বলল, "চল, তোকে খানিকটা এগিয়ে দি।"
খুশী হল মৃগেন। "স্টেশন পর্যন্ত চল তবে।"
"চল।"
এই রাস্তাটা ভিড়ে ভিড়াক্কার। মানুষ-জন, রিকশা, সাইকেল, মাঝে-মধ্যে মোটর গাড়ি। দিন দিন যেন ঠাস হয়ে যাচ্ছে।
"লাহাগলি দিয়ে চল মৃগু, সোজা ধোবি মহল্লায় উঠব, সেখান থেকে শর্ট কাট মেরে স্টেশন," জোছন বলল।
"চল।"
লাহাগলির রাস্তাটা সরু, কিন্তু নিরিবিলি অনেকটা।
জোছন সিগারেটের প্যাকেট বার করে মৃগেনকে সিগারেট দিল, নিজে ধরাল। তার পর হঠাৎ বলল, "তুই কি শত্যের কথা বিশ্বাস করলি ?"
"বিজনেসের কথা ?"
"আরে না ! বিজনেসের প্ল্যান শতোর অনেক দিনের। হয়ত শালা লেগে পড়বে। আমি অন্য কথা বলছি। বিয়ের ! স্রেফ বাজে কথা। শতোর খচড়ামি।"
মৃগেন হেসে ফেলল। "চোরের মন বোঁচকার দিকে।"
"না রে, তা নয়। আমি চোর নেই। তুই একটা সোজা কথা ভেবে দেখ না ! আজকাল কোনো ছেলে বাইশ-চব্বিশে বিয়ে করে! সে আমাদের

বাপ-ঠাকুরদারা করত। সুখের দিন ছিল ভাই ওদের। ভাবনা চিন্তার বালাই ছিল না। আমাদের হল রগড়াবার দিন, পাছার ছাল উঠে গেল রগড়াতে রগড়াতে।" জোছন হো হো করে হেসে উঠল।

মৃগেন হাসছিল। "তা ঠিক।"

"ঠিক কি রে ষোলো আনা ঠিক।" জোছন বলল, "বাবা গল্প করে ছেলে-বেলায় রামশাল চালের মণ ছিল দেড় দু টাকা। টাকায় চার পাঁচ পো দুধ। নে শালা—খা কত খাবি। তিরিশ টাকা মাইনের রাজা। আর আজ-কাল তিরিশ টাকায় তোর দু-দিনও চলবে না।"

মৃগেন সিগারেটের ধোঁয়া গলায় ভরে বলল, "জানি। আমি মার্কেট ম্যানেজার।"

"কিন্তু ওটা ওপরের ব্যাপার। দেড় টাকা মণ রামশাল চাল হলেই মানুষ সুখে গলে যায় না। তখনও অনেকে খেতে পেত না। আজও পায় না। আমি ও-কথা বলছি না। আমি বলছি, আমাদের আগের জেনারেশানের সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল লিমিটেড। বুঝলি না? মানে বেশ একটা ছোটো-খাটো জগৎ নিয়ে দিব্যি থাকত তারা। চাকরি ব্যবসা বাবা-মা বিধবা বোন সতীলক্ষ্মী বউ সংসার ছেলেমেয়ে···এই সব। বেশি কিছু বুঝত না, ঝঞ্ঝাটেও থাকত না। আনন্দ হলে রসগোল্লার মতন মুখ করে নাচত, আর দুঃখ-শোক পেলে ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ত। ভেরি সিমপল, স্ট্রেট ব্যাপার!"

মৃগেন একটু অবাক হচ্ছিল। জোছন বরাবরই ঝোঁকের মাথায় কথা বলে, একটু বক্তিয়ার খিলজী টাইপের, কিন্তু আজ যেন আরও একটু বেশি ঝোঁক এসে গিয়েছে। মৃগেন ঠাট্টা করে বলল, "তোর হয়েছে কি রে? বিয়ের নামে ফিলিং এসে গেল!"

"না রে শালা, বিয়ের নামে আমার ফিলিং রাইজ করে নি," জোছন নিজেই হাসল। তারপর বলল, "তুই আমার কথাটা বুঝছিস না। তোর মায়ের সঙ্গে তোর তফাতটা ভেবে দেখিস, বুঝতে পারবি। ছেলেবেলায় আমরা কী খেলতাম বল্! মার্বেল, গুলি, ডাণ্ডা, টেনিস বল—কিংবা ধর ঘুঁড়ি

ওড়ালাম। তাতেই কত সুখ ছিল। কী থ্রিল! আজ তুই চল্লিশ পঞ্চাশটা গুলি জমিয়ে নিজেকে মার্বেল কিং ভাবতে পারবি! ছেলেবেলায় আমরা পারতাম।”

মৃগেন শুনছিল, কথা বলল না। জোছন বলল, “ব্যাপারটা ওই রকম। আমাদের বাপঠাকুরদাদা একেবারে সাদা মাটা সহজ অনেক জিনিস নিয়ে ফাসট্ কেলাস কাটিয়ে গিয়েছে। গিন্নী পান সেজে দিল, কর্তা পান চিবুতে চিবুতে গিন্নীর বাঁধাকপি দেখে পুলক অনুভব করল। পারবি তুই?”

মৃগেন বিকট ভাবে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে যায় আর কি!

জোছনও হা হা করে হাসছিল।

লোকজন পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

চোখ মুছতে মুছতে মৃগেন বলল, “তুই শালা একেবারে খিস্তিবাজ হয়ে গিয়েছিস!”

“না ভাই, ট্রুথ বলছি। মোদ্দা কথাটা হল কী জানিস মৃগু! আমরা এমন এক টাইমে এসে পড়েছি যখন সব ব্যাপার প্যাঁচালো, জটিল হয়ে গিয়েছে। আমাদের ভাল লাগা মন্দ লাগা, পছন্দ করা, ভক্তি-ফক্তি, মায় তোর ভালবাসা পর্যন্ত। মানুষের ইমোসান্‌স্ যদি পালটে যায়, মানে—কী বলব —আগের মতন বাল্য—এই আমি ভালগার হচ্ছি না—রিয়েলি বাল্য মীন করছি, বাল্য টাইপের না থাকে, সাবালক হয়ে যায়—কী করতে পারি! নাথিং।”

“তোর এ-সব জ্ঞান কবে থেকে হচ্ছে রে?” মৃগেন হালকা হাসি গলায় বলল।

“ঠাট্টা করছিস!…শোন তা হলে, আমি নবেল পড়ে এ-সব শিখি না। দেখি। তুই নিজে একটু দেখবি। বুঝতে পারবি। কাকিমাকে ওয়াচ করবি, বুঝতে পারবি। কাকিমার সঙ্গে কেতুদির তফাতটা কোথায় দেখিস না। তবু কেতুদি মেয়ে!”

মৃগেন খানিকটা অন্যমনস্ক হল। “তফাত তো থাকবেই।”

"আমি ওই কথাই বলছি," জোছন বলল, "এই তফাতটাই আমাদের জোর মেরে দিয়েছে। বাপ ঠাকুরদার মতন লিমিটেড্ মন-মেজাজ নিয়ে আমরা থাকতে পারি না। আমাদের পাছায় সব সময় কেউ খোঁচাচ্ছে। ঠিক কি না?"

মৃগেন কোনো জবাব দিল না। তারা ধোবি মহল্লায় এসে পড়েছিল। নামেই ধোবি মহল্লা— আসলে আট দশ ঘর ধোপা থাকে, বাকি সব অন্য ধরনের লোক, বেশির ভাগই বাজারের ব্যাপারীরা। এক কালে এখানে একটা বড় পুকুর ছিল, কাপড় কাচত ধোপারা। তারা দু চার ঘর থাকতে শুরু করল। লোকে বলতে লাগল ধোবি মহল্লা। বলতে বলতে সেটা এই মহল্লার নাম হয়ে গেল।

ধোবি মহল্লার বারো আনাই বিহারীর বাস। চতুর্দিকে ফাগুয়ার গান বাজনা শুরু হয়ে গিয়েছে। অশ্বত্থ আর নিমগাছের ফাঁক দিয়ে দূরের সিগন্যাল দেখা যাচ্ছিল।

স্টেশনের দিকে পা বাড়িয়ে মৃগেন বলল, "জোছন, তুই অনেক কিছু বুঝিস, আমি বুঝি না। আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়? আমি একটা বুদ্ধু।"

"না ভাই, বিনয় ছাড়ো, তুমি বুদ্ধু নও। শতো শালা তো বিচ্ছু।" জোছন হাসল।

মৃগেন বলল, "আমি তোর মতন অত ভেবে কিছু দেখি না। তবে একটা জিনিস মাকে দেখে বুঝতে পারি।...এই দেখ না কেন, আমরা তো ও-বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম। মা কিন্তু নতুন বাড়িতে এসে খুব একটা খুশী নয়। যে কোনো কথায় একবার পুরনো বাড়ির কথা তুলবে। অথচ তুই দেখেছিস কী ভাবে আমরা থাকতাম ওখানে।"

জোছন বলল, "কাকিমার মায়া রয়েছে। মায়া, ভালবাসা, টান...।"

"জানি। কিন্তু কেন? দিদির একেবারে নেই, আমার তবু একটু-আধটু আছে।"

"তোদের থাকবে না, কাকিমার থাকবে," জোছন গলা পরিষ্কার করল,

"কাকিমার জীবনের কতটা ওই বাড়ির সঙ্গে জড়ানো ছিল ভেবে দেখ। তোদেরও ছিল, কিন্তু কম। কাকিমা ও-বাড়ির সমস্ত কিছু অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন, ভাল মন্দ। তোরা পারিস না। তোরা রিজেক্ট করতে পারিস। কেন না তোদের সত্যিই তেমন কোনো মায়া-মমতা ভালবাসা নেই ও-বাড়ির ওপর, বাড়ির লোকজনের ওপর।...আমার বাবাকেও এইরকম দেখেছি। বাবার ঘরের সামনে জামগাছটা পেল্লায় হয়ে গিয়েছে কবে— মাটির তলায় শেকড় ছড়িয়ে দেওয়াল ফাটিয়ে দেবে এবার। যখনই বলি, গাছটা কেটে ফেলো -- তখনই বলে, থাক থাক আর ক' দিন দেখি। গাছ কাটা তো হাতেই রয়েছে, দু দিনের ব্যাপার। কত বছর ধরে গাছটা হল, বল? মায়া লাগে না।...নে, বোঝ এবার। মায়া মায়া করেই গেল।"

মৃগেন কোনো জবাব দিল না।

আরও খানিকটা হেঁটে এসে মৃগেন বলল, "আমাদের বাড়িতে কি-একটা হয়েছে রে। মা চুপচাপ। দিদি চুপচাপ। সারাদিন বাড়িটা কেমন থমথম করে। আমি কিছু বুঝতেই পারি না। ভীষণ খারাপ লাগে। কী হল, বুঝতেই পারি না।"

জোছন চুপ করে থাকল।

এ-বাড়ি ও-বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল কেতকী, তার-পর মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঝিলের দিকে চলল। আজ ক'দিন ধরে ঝকঝকে জ্যোৎস্না। সামনে দোল পূর্ণিমা। এমন কিছু রাত হয়নি, সন্ধে গড়িয়ে গিয়েছে।

দক্ষিণের বাতাসও আজ যেন পাগলের মতন মাঠঘাট ডিঙিয়ে ছুটেছে। রেল লাইনের ওপারে মটর ক্ষেতের মাথার ওপর চাঁদ। নবমী বা দশমী হবে।

কেতকী উদাসভাবে হাঁটছিল, বাতাসে পিঠের কাপড় সরছে, পায়ের কাপড় উড়ছে, মৃদু শব্দ করে। খেয়াল করছিল না কেতকী। কোনো দরকার নেই। নিউ কোয়ার্টারসের মজুর-ছাউনির হোলির গান-বাজনার হল্লা ভেসে

আসছিল বাতাসে।

ঝিলের কাছাকাছি এসে কেতকী দাঁড়াল। একটু বসলে হয়। ভয়-ভাবনার কিছু নেই। মা বাড়িতে। তার কোনো তাড়াও নেই বাড়ি ফেরার।

বাড়িতে কেমন একটা চাপা থমথমে ভাব চলেছে। মা গম্ভীর। খানিকটা বুঝি বিরক্ত। অখুশী। কথাবার্তা বেশি বলে না। কেন যে মা এই রকম চুপচাপ রয়েছে কেতকী বুঝতে পারে না। অনুমান করে নানা রকম। কেতকীর নিজেরও যে কী হয়েছে কে জানে। তারও চুপচাপ থাকতে ভাল লাগে, একা থাকলেই স্বস্তি পায় বেশি। কেন?

মেজোজেঠি এসে ফিরে যাবার পর থেকেই এ-বাড়িতে কিছু ঘটে গিয়েছে। কী ঘটেছে কেউ বুঝছে না, কেউ কাউকে বলছে না। এক একবার কেতকীর সন্দেহ হয়, মেজোজেঠির মুখের ওপর সরাসরি না বলে দেওয়ায় মা অসন্তুষ্ট। মা হয়ত চায় নি মেজোজেঠির এমন বিপদের দিনে কেতকী নিষ্ঠুরের মতন জেঠিকে তাড়িয়ে দেয়। যদি মা এই রকম কিছু ভেবে থাকে তবে তো বলার কিছু নেই। মেজোজেঠির বিপদ কেতকী কেন ঘাড় পেতে বইতে যাবে! তা ছাড়া এ-বিপদ যখন সাধারণ নয়। কোন্ মানুষ অন্যের পাপ নিজের বাড়িতে ঢোকাতে চায়। মা হয়ত বলবে, দশ বিশটা দিন পদ্মাকে রাখলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। কেউ দেখতে আসত না, জানতেও চাইত না কী হয়েছে পদ্মার! বোনের বাড়িতে বোন আসে না দু দশ দিনের জন্যে! তবে?

কেতকী অবশ্য তা মনে করে না। ও-বাড়ির নোঙরামি সে এ-বাড়িতে কেন ঢোকাবে! একবার ঢোকালে তার পরিণাম কী দাঁড়াতে পারে মা জানে না। বা বুঝতে পারছে না। মৃগুর কথাই ধরুক না কেন মা! মৃগু হয়ত এ-সব কথা জানে না। না-জানাই স্বাভাবিক। মা নিজেই কি জানত? মৃগুই বা কেমন করে ও-বাড়ির মেয়েলী কথা জানতে পারবে। পদ্মা এখানে থাকলে কোন্ কথায় কী কথা হত—মৃগু হয়ত জেনে যেত। ছি ছি।

আরও একটা সন্দেহ কেতকীর হয়। মা হয়ত ভাবছে, মেজোজেঠির মেয়েই তো মেয়ে নয়, কেতকীও তো মেয়ে। আইবুড়ো মেয়ে কাঁধে নিয়ে বসে

থাকার অনেক যন্ত্রণা। মেয়ে চাকরি করে, একা একা ঘোরা-ফেরা করে, ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয় অফিসে। কেউ কি জোর করে বলতে পারে আজ যা এক মেয়ের বেলায় ঘটেছে অন্য মেয়ের তা ঘটবে না? হয়ত অতটা বাড়াবাড়ি হবে না, তবু কিছু ঘটতেই পারে। সব জিনিসের একটা স্বাভাবিক গতি আছে। বয়েসের, শরীরের, মনের! মা হয়ত ভয় পায়। মেয়েকে অবিশ্বাস করার কারণ না থাকলেও ভয় বা দুশ্চিন্তা তো হতেই পারে।

কেতকী অবশ্য স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না, মার কী হয়েছে, হতে পারে। কেন মা গম্ভীর, বিরক্ত, অসুখী। আর এটাও বড় আশ্চর্যের কথা, কেতকী নিজেও কেন যেন সেই দিন থেকে মনের মধ্যে কেমন এক অশান্তি, বিরক্তি অনুভব করছে! মেজোজেঠির ওপরই রাগ হচ্ছে বেশি। কেন তুমি এলে? ও-বাড়িতে থাকার সময় তুমি কবে, কোন কালে আমাদের আপদ বিপদ দেখেছো? কবে এসে বলেছ, 'কেতু তুই আমার মেয়ে তোর বিপদ আমারও বিপদ, বল তোর কী হয়েছে?' কোন্ দিন তুমি এসে তোমার ছোট জার পাশে বসে বলেছ, 'ছোটো—আমি তোর পাশে আছি —ভাবিস না।'···এসব কথা তোমরা বলো নি মেজোজেঠি! আমাদের হয়ত ঠিক এমন বিপদ হয় নি—কিন্তু অনেক দুঃখ, অপমান গায়ে লেগেছে আমাদের, তুমি কোনো দিন ছুটে আস নি। আজ কেন এসেছো? আজ তোমার মনে হয় না, আমাকে নিয়ে, আমার চাকরি করা নিয়ে তুমি কত ঠেস দেওয়া কথা বলেছ?

কেতকী যা করেছে সবাই এই রকম করত। সব মানুষই নিজের স্বার্থ, ভাল-মন্দ দেখে। কেতকীও দেখেছে। এর বেশি কিছু নয়।

তবু কোথায় যেন এক অশান্তি থেকে যাচ্ছে! কেন, কী জন্যে কেতকী বুঝতে পারছে না।

অন্যমনস্কভাবে চোখ তুলতেই কেতকীর চোখে পড়ল কে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। ক' মুহূর্ত তাকিয়েই বুঝতে পারল, তপু।

তপু! এ-সময়। এখানে? বাড়িতে না বসে এদিকেই বা আসছে কেন?

কেতকী অপেক্ষা করতে লাগল।
কাছাকাছি এল তপু। "তুমি এখানে?"
"বেড়াচ্ছিলাম। তুমি হঠাৎ?"
"তোমার কাছে এসেছিলাম। কাকিমা বলল, তুমি এদিকেই কোথাও আছ। চোখে পড়ল, তাই এখানে এলাম।"
কেতকী কাপড় সামলাল। "বলো কী দরকার?"
তপু সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তপুর পরনে পাজামা, গায়ে শার্ট। একেবারে মামুলী ধরনের। রোগা চেহারা। দেখতে মোটামুটি। বড় বড় চোখ। কেমন যেন নির্বোধের মতন দেখায়।
বিরক্ত হল কেতকী। তপুকে তার কখনও কখনও অসহ্য লাগে। ভিখিরি কিংবা চোরের মতন আসে। কথা বলে মিন মিন করে। সব সময় কাঁদুনি আর হাত পাতা।
"কী দরকার তোমার?" কেতকী আবার বলল।
"তুমি এমন করে বলছ যেন আমি দরকার ছাড়া আসি না?"
তপুর গলায় সামান্য ক্ষোভ।
কেতকী একটা শক্ত কথা বলতে যাচ্ছিল, বলল না। লক্ষ্য করল সাবধানে। তপুকে খানিকটা পরিষ্কার দেখাচ্ছে। চুল কেটেছে বোধ হয়, মুখে নোংরা দাড়ি নেই। তপুর মতন নোংরা কেতকী কম দেখেছে জীবনে। জামা কাপড়ের ঠিক নেই, চিট ছেঁড়া—যা পেল পরল। অর্ধেক দিন না মাথায় একটু তেল দেয়, না দাড়ি কামায়। পায়ের চটিটা দেখলে পর্যন্ত ঘেন্না হয়। নোংরা, অলস, নির্বোধ।
কেতকী বলল, "ও, এমনি বেড়াতে এসেছো! তা আমার কাছে কেন? তোমার কাকিমার কাছে গিয়ে বসো।"
তপু কিছুই বলল না। পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করল। তার নস্যির নেশা।
কেতকী দাঁড়িয়ে না থেকে দু এক পা এগিয়ে গেল।
মল্লিকবাড়িতে হরেক রকম লোক দেখেছে কেতকী; অহঙ্কারী, মূর্খ, শয়তান,

চোর, লম্পট, নিষ্ঠুর, কালীভক্ত, আবার একটু নরম-সরম মানুষও। তপু এর কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। সে অবশ্য মল্লিকবাড়ির সরাসরি কেউ নয়। তার শরীরে মল্লিকবাড়ির রক্ত নেই। সে সেজো জেঠার পোষ্য। তার ভাগ্যও বড় অদ্ভুত। সেজ জেঠার বিয়ের বছর চারেক পরেও সেজো জেঠির পেটে বাচ্চাকাচ্চা এল না। জেঠি বাচ্চা-বাচ্চা করে পাগল হয়ে যাচ্ছিল। নানান রকম মেয়েলী অসুখ। তখন সেজো জেঠা এক পোষ্য নিল। সেজো জেঠিরই দূর সম্পর্কের কোনো বিধবা বোনের ছেলে, বোন মারা গেছে সদ্য। ঘটাপটা করে পোষ্য নেওয়া হল তপুকে। কিন্তু এমনই কপাল, সে ও-বাড়িতে আসার পর পরই জেঠির পেটে বাচ্চা এল। প্রথমেই জোড়া-সন্তান। একজন আঁতুড়ে মারা গেল, অন্য জন্য বেঁচে গেল, আজও সে বেঁচে আছে। সেজো জেঠির তখন থেকেই প্রায় বছরে বছরে বাচ্চা। কেউ পেটে নষ্ট হয়, কেউ আঁতুড়ে মারা যায়। বা দু চার মাস পরে। তা সব মরে ধরেও যা থাকল সেজো জেঠির—তাও জনা তিনেক। তপু হল বাড়তি। সেজো জেঠির সংসারে তপুর দাম ঠিক হবার আগেই সে ফাউ হয়ে গেল, ফলে একেবারে মূল্যহীন হয়ে পড়ল। যদি সম্ভব হত তপুকে ফেরত পাঠাত জেঠা-জেঠি। সেটা সম্ভব হল না। তপু মল্লিকবাড়িতে আগাছার মতন বাড়তে লাগল। বেড়ে বেড়ে আজ এই অবস্থা।

মানুষের একটা কিছু গুণ থাকে, অন্তত কোনো একটা ব্যাপারে মাথা থাকে। তপুর কিছুই নেই। স্কুলে ঘষড়ে ঘষড়ে টেন ক্লাস পর্যন্তও গেল না, শরীর-স্বাস্থ্য বরাবরই রোগা-সোগা থেকে গেল, পরিশ্রমের ক্ষমতা নেই, বুদ্ধি নেই, দুটো কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। সেজো জেঠির ফরমাস খেটে-খেটে জীবন কাটল ওর। কাজের মধ্যে এখন যা করে সেজো জেঠার সাইকেলের দোকানে বেগার খাটে।

কেতকী যে তপুকে পছন্দ করে তা নয়। তার ঘেন্না হয়, রাগ হয়। তবু কবে কোন কাল থেকে সে এই অদ্ভুত, অক্ষম, নির্বোধ ছেলেটাকে খানিকটা প্রশ্রয় দেয়। মায়া-মমতা, নাকি অন্য কিছু?

পাশে তপু। কেতকী বলল, "মেজোজেঠি কী বলছে?"

"মাথার ঠিক নেই।"

"এখনও রোজ মারধোর করছে?"

"বন্ধ করে রেখে দেয়। মাথার চুল কেটে দিয়েছে—"

কেতকী দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল। "মাথার চুল কেটে দিয়েছে মানে? কী বলছ?"

তপু হাত দিয়ে কাঁচি চালাবার ভঙ্গি করল। "এত্ত এত্ত চুল, কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়েছে।"

কেতকীর সারা গা শিউরে উঠল, বিরক্তিও লাগল। পদ্মার মাথায় চুল ছিল অঢেল, কোমর-ছাড়ানো। ঘন, কালো চুল। নিজের চুলের দেমাক সে নিজেও কম দেখাত না। মেজোজেঠি সেই চুল কেটে দিল। ছি ছি। সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে মেজোজেঠির।

কেতকী বলল, "এই রকম করে রোজ, বাড়ির লোকজন তো সবাই জেনে যাচ্ছে…"

"জানে সবাই। খারাপ খারাপ কথা বলে।"

কেতকী অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকাল। পদ্মা যে কেন এমন করে নিজের সর্বনাশ করল-কে জানে! সে দেখতে খারাপ নয়, তার রঙ ততটা পরিষ্কার না হলেও গড়ন ভাল। একেবারে বোকাও তো নয়। একটু জেদী, একগুঁয়ে। অনেকটা মেজোজেঠির স্বভাব।

দুঃখ হচ্ছিল কেতকীর। রাগও হচ্ছিল। কার ওপর সে জানে না।

তপু বলল, "মেজোজেঠি কাল বঁটি দিয়ে নিজের হাত কাটতে যাচ্ছিল, মেজদা না থাকলে কেলেঙ্কারী হত।"

কেতকী আবার শিউরে উঠল। মেজোজেঠি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ কী মনে করে কেতকী বলল, "মেজোজেঠি আমাদের কাছে এসেছিল জানে কেউ ও-বাড়ির?"

"না," মাথা নাড়ল তপু।

"একদিন জেনে যাবে।"

"না," মাথা নাড়ল তপু। "আমি বলব না।"

মেজোজেঠি সেদিন প্রথমে কিছু না বললেও পরে কেতকী দেখেছিল, তপু মেজোজেঠিকে নিয়ে যাবার জন্যে অন্ধকারে রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তপুই এনেছিল মেজোজেঠিকে। তপু অবশ্য পরে আর অস্বীকার করে নি কথাটা। মেজোজেঠি তাকে হাত-পায়ে ধরেছিল, কী করবে সে!

কেতকীর কেমন রাগ হল। "তোমার কি কোনো দিন বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না। কেন সেদিন তুমি মেজোজেঠিকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলে? কার কী হচ্ছে তাতে তোমার কী?"

তপু কোনো জবাব দিল না।

আবার হাঁটতে লাগল কেতকী।

"আমি বেশ বুঝতে পারছি, মেজোজেঠি পাগল হবে। হয়ে মরবে। মেয়েটাও ছাদ-টাদ থেকে ঝাঁপ খাবে একদিন।"

তপু কেমন একটা শব্দ করল।

কেতকী তাকাল। মনে হল, তপু কিছু বলব বলব করছে, বলছে না।

আবার হাঁটতে লাগল কেতকী। তপু দু পা পেছনে। এলোমেলো দমকা বাতাস উঠল ঝড়ের মতন। কাঁধের কাপড় উড়ে গিয়ে পিঠ দেখা যাচ্ছিল কেতকীর। আঁচল সামলাতে সামলাতে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। কপালের চুল চোখের ওপর। এত বাতাস এই ফাঁকায় সামলানো যায় না।

খানিকটা সামলে নিয়ে কেতকী ঝিলের দিকে তাকাল। জলে চাঁদ উঠেছে যেন।

কী মনে করে কেতকী বলল, "তোমার দরকারটা কী বলছ না যে?"

তপু এবার ইতস্তত করে বলল, "আমায় গয়ায় যেতে বলছে।"

"গয়ায়! কেন?"

তপু চুপ।

কেতকী বিরক্ত বোধ করছিল। "গয়ায় কার পিণ্ডি দিতে যাবে?"

কেমন কাতর মুখ করল তপু। মিনমিন করে বলল, "পিণ্ডি নয়। আমায় যেতে বলছে।"

"কে?"

"সেজো কর্তা।"

কেতকী কিছুই বুঝতে পারছিল না। তপু সেজো জেঠার পোষ্য। সামনা সামনি বাবা বলে, আড়ালে সেজো কর্তা। সেজো জেঠা হঠাৎ তপুকে গয়ায় যেতে বলবে কেন?

কেতকী অধৈর্য হয়ে বলল, "যা বলার স্পষ্ট করে বলতে পার না? তোমার সঙ্গে কথা বলা এক ঝকমারি।"

তপু যেন ধমক খেয়ে কথা গুছোতে লাগল। তারপর বলল, "আমি একলা যাব না। মেজোজেঠি আর পদ্মা যাবে।"

কেতকী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। "মেজোজেঠি আর পদ্মাকে নিয়ে যাবে!···ও! তা তোমায় কে যেতে বলল?"

"বললাম তো সেজো কর্তা!"

"কেন?"

"জানি না।"

তপুকে এক দৃষ্টে লক্ষ করছিল কেতকী। "কে আছে সেখানে?"

"সেজো কর্তার জানাশোনা লোক আছে।"

কেতকী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। হাঁটতে লাগল। তপুও পেছন পেছন যাচ্ছিল।

"গয়া যাবার পরামর্শ কার?" কেতকী জিজ্ঞেস করল।

"সেজো কর্তা আর মেজোজেঠিতে কী কথাবার্তা বলে। আড়ালে।"

কেতকী আন্দাজ করতে পারল। পরামর্শ বোধ হয় সেজো জেঠার, তারই না লোক রয়েছে গয়ায়।

"কবে যেতে বলেছে?"

"তা বলে নি। দোলের পরই যেতে হবে হয়ত।"

মেজো জেঠির মেয়েকে নিয়ে গয়া যাবার কারণটা কেতকী অনুমান করতে পারছিল। তপুকে খোলাখুলি আর কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না। কিন্তু একটা ব্যাপারে সে অবাক হচ্ছিল। মেজো তরফের সঙ্গে সেজো তরফের সম্পর্ক এমন নয় যে একজনের বিপদে অন্যজন ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। তবু

সেজো জেঠার এত দয়ামায়া হল কেন? অবশ্য এটা ঠিক, সেজো জেঠা এখন মল্লিক বাড়ির মাথা। মানে বড় এবং ছোট—কোনো দিকেই কেউ নেই ভাইয়েদের মধ্যে—কাজেই লোকাচারের দিক থেকে সেজো জেঠাই কর্তা। সেই সুবাদে জেঠার কর্তব্যজ্ঞান দেখা দিয়েছে এটা ধরে নেওয়া শক্ত। খেয়োখেয়ি, আঁচড়া-আঁচড়ি ভুলে হঠাৎ এত উদার হয়ে উঠবে সেজো তরফ মনে হয় না। অথচ হয়েছে।

কেতকীর কেমন সন্দেহ হল, এমন হতে পারে মেজোজেঠি নিরুপায় হয়ে সেজো জেঠাকে ধরেছে। আর সেজো জেঠাই যা করার গোপনে করেছে। অন্যরা জানে না। মল্লিক বাড়ির মান বাঁচাবার চেষ্টা করছে নাকি সেজো জেঠা? এক নোঙরামি থেকে অন্য নোঙরামি?

তপু কিছু বলল। কেতকী অন্যমনস্ক ছিল, খেয়াল করে শোনে নি।

"কিছু বললে?"

"একটা কথা—"

"বলো?"

"সেজো কর্তা বলছিল, গয়ায় আমার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"মানে?"

"এই কাজকর্ম করার। থাকার।"

কেতকীর হঠাৎ অন্য রকম সন্দেহ হল। তপুকে দেখল। "বুঝতে পারলাম না। মেজোজেঠিদের নিয়ে তুমি যাচ্ছ। তারা আবার ফিরে আসবে, তুমি আসবে না?"

"আমি জানি না। সেজো কর্তা..."

কেতকীর হঠাৎ যেন মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বিশ্রীভাবে চিৎকার করে কেতকী বলল, "তুমি কুকুর না মানুষ। সেজো কর্তা তোমায় যা করতে বলবে তুমি করবে? সে তোমার কে? দয়া করে দুটো ডালভাত দিয়ে মানুষ করেছে বলে তার তুমি কুকুর হয়ে গেছ? তোমার লজ্জা করে না? জন্তু কোথাকার!"

তপু মাথা নিচু করে থাকল। কথা বলল না।

কেতকীর সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। মাথা আগুন। জোরে জোরে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছিল।

দু জনেই চুপ।

শেষে মাথা তুলে তপু বলল, "কাকিমাকে কিছু বলো না। আমি যাই।"

তপু পা বাড়াল।

কেতকী দেখছিল তপু কত দূর যেতে পারে। তপু হনহন করে এগিয়ে গেল অনেকটা। পেছন ফিরে তাকাল না।

কেতকী আচমকা চেঁচিয়ে উঠল। "তুমি কোথাও যাবে না, যদি যাও আমি তোমায় দেখে নেব।"

তপু দাঁড়াল না।

চায়ের দোকানেই ছিল শতদলরা। মৃগেন এসে দেখল, নীলেন্দুও এসেছে।

"কিরে! এসেছিস!" মৃগেন হাসিমুখে বলল।

"আজই বেরোলাম বাড়িতে আর ভাল লাগছিল না," নীলেন্দু বলল।

"বোস! এখানেই বোস।"

মৃগেন বসল। নীলেন্দু পাশেই। একই চেয়ারে।

আজ রবিবার। চায়ের দোকানে সকালের ভিড় অন্যদিনের তুলনায় বেশি। শ্রীপদর দোকান বড় নয়, চওড়ার দিকটা ছোট, লম্বায় তবু খানিকটা আছে। সাত আটটা টেবিল ভরতি, লোহার চেয়ার কাঠের চেয়ার একটাও খালি নেই। দোকানে যাদের জায়গা হচ্ছে না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে।

এই ভিড় আর খানিকটা বেলায় কেটে যাবে। এখন বাজার-হাটের সময়, ছুটির দিন, তাই এত ভিড়।

পান্নু বলল, "আজ তোর বাজার-ফাজার নেই?"

"না," মাথা নাড়ল মৃগেন, "দিদি নিজে স্টেশনের বাজারে গিয়েছে।"

"তুই বুঝি বেশি চুরি করছিলি?"

হেসে উঠল শতদলরা।

পান্নু হাসতে হাসতে বলল, "হাসির কিছু নেই রে; এ আমার পারসোন্যাল

এক্সপিরিয়েন্স। মা আর আমায় বাজারে পাঠায় না। ছোট ভাইকে পাঠায়। বেইজ্জত করে দিয়েছে মা।”
জোছন বলল, “তোর তো সবই ওই রকম। রয়ে-সয়ে কিছু করতে শিখিস নি। চুরিরও একটা টেকনিক আছে। আমার কাছে শিখে নিস।”
“তোর কাছে! তুই শালা বাজারের কী জানিস? আলু চিনিস?”
“তোরটা চিনি।”
শতদল বিকট ভাবে হেসে উঠল। নীলেন্দু, মৃগেন, জোছনও হাসছিল। মায় পান্নুও।
পাশের টেবিলে রজনীরা বসে চা খাচ্ছিল।
রজনী বলল, “কী হল শতোদা?”
শতদল হাসি সামলাতে সামলাতে বলল, “জোছন পান্নুকে চুরির টেকনিক শেখাচ্ছে।”
“দারুণ জিনিস!...জোছনদা, আমাকে একটু শিখিয়ে দিও।”
রজনী স্কুলের মাস্টার। নতুন মাস্টারিতে ঢুকেছে।
রজনীর পাশ থেকে গণেশ বলল, “শতোদা, আজকাল আর দোলের হইচই হয় না। মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ট্রাডিশনটা নষ্ট করে দিলে। মাঝের পাড়া এবারে বিরাট দল বার করবে।”
“তোরা লাগা। আমরা বুড়ো হয়ে গিয়েছি।”
“তোমরা বুড়ো...” গণেশ হেসে উঠল।
কার্তিক বলল, “না শতোদা, আমরা সত্যি সত্যি একটা প্ল্যান করছিলাম। আমরা কী মরে যাচ্ছি! জোছনদাকে বলো না...।”
জোছন বলল, “তোরা লাগা। আমরা আছি।”
“তার মানে আমাদের নাচতে নামিয়ে তোমরা কেটে পড়বে?”
“না। কেটে পড়ার বিজনেস আমার নেই। মরদ্ কা বাত্...। লাগা তোরা। আমরা আছি। মাঝের পাড়াকে কালুয়া করে দেব।”
রজনীদের টেবিলে হুল্লোড় উঠল। গণেশ বলল, “আমরা তা হলে পার্টি ঠিক করে ফেলি। ঝম্প পার্টি।”

"করে ফেল। পানুকে ঝম্প বাজাতে দিবি। ওর হাত মিষ্টি।"
আবার হাসাহাসি হল।
মৃগেন চেঁচিয়ে চা চাইল। তারপর বলল, "সত্যি জোছন, আমরা কেমন মেদামেড়া হয়ে যাচ্ছি। লাইফ্ নেই।"
ও দিকের টেবিলে প্রতুলরা জোর তর্ক লাগিয়েছে। প্রতুল গলা তুলে চেচাঁচ্ছে ; ভায়োলেন্স আপনি আসে না, রাজা। বীজ পুঁতলে তবে গাছ হয়। তোমাদের কংগ্রেস কী বিচি পুঁতে গেছে বুঝছ না? প্রতুলকে দমাবার জন্যে বিরিজলাল বলল, 'তুম শালা বেকার চিল্লাও মাত। পেড় সে ফল্, ফল্ সে বীজ। আগাড়ি পেড় না বীজ্। বাতাও?'
প্রতুলরা সমানে তর্ক চালাতে লাগল। মনে হচ্ছিল যে কোনো সময়ে হাতা-হাতি লেগে যাবে।
চা এসেছিল মৃগেনের।
চায়ে চুমুক দিয়ে মৃগেন নীলেন্দুকে বলল, "তোর শরীর অল রাইট?"
"অনেকটা।"
"ওষুধ খাচ্ছিস?"
"একটা টনিক খাচ্ছি।" নীলেন্দু জোছনের দিকে হাত বাড়াল। "একটা সিগারেট দে খাই।"
জোছন প্যাকেটটা ঠেলে দিল। বলল, "চা খেয়ে চল শতোর বাড়ি যাই। এ হল্লা এখন চলবে।"
মৃগেন সন্দেহের চোখে তাকাল। "দাবা?"
"না না, দাবা নয়।"
"তোমরা দুই গুরু শিষ্য মিলে যদি দাবা নিয়ে বসো, আমি চলে যাব।·· সকাল বিকেল সন্ধে—সব সময় দাবা! তোরা ভেবেছিস কী?"
জোছন হেসে বলল, "গুরু এখন দাবা খেলছে না। তুমি তো ভাই জানো, গুরু এখন কাগজে-কলমে বিজনেস করছে!"
শতদল বলল, "খুব রস করছ বেটা। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। বাবার সঙ্গে আমার কাল রাত্তিরে স্ট্রেট টক্ হয়ে গিয়েছে। বাবা বলেছে, আমি এক পয়সা দেব

না। আমি বললাম, আমার মার গয়না দাও। আমি গয়না বেচে টাকা জোগাড় করব। বাবা বলল, গয়না তোমার বউ পাবে, তুমি নও। আমি বললাম, বেশ—তা হলে আমার বিয়ে দাও। বউয়ের কাছ থেকে ঝাড়ব।"

পান্নু অদ্ভুত এক শব্দ করে হেসে উঠল। জোছন আর নীলেন্দু হো হো করে হাসতে লাগল। নীলেন্দু চা খাচ্ছিল, খানিকটা চা চলকে পড়ল টেবিলে।

"তোরা না, সত্যি!"

হাসি থামলে শতদলই বলল, "বাবা অ্যায়সা ঘাবড়ে গেল আমার কথা শুনে যে বলল, ঠিক আছে, তোমার প্ল্যান দাও, বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলল।"

জোছন বলল, "খুব ভাল কথা। তোদের একটা হিল্লে হলে আমি সত্য-নারায়ণ চড়াব। মাইরি।"

চায়ের দোকানে আরও খানিকটা বসে জোছনারা উঠে পড়ল।

রজনী বলল, "জোছনদা, আমরা কিন্তু তৈরি হচ্ছি।"

"হু। আর টাইম নেই।"

"গোটা তিন চার টাকা চাঁদা লাগবে যে!"

"কাল নিয়ে নিবি।"

রাস্তায় নেমে পান্নু বলল, "আমায় একবার রেলের বুকিং অফিসে যেতে হবে। তোরা যা। আমি ঘুরে আসছি।"

শতদলরা নীলেন্দুর দিকে তাকাল।

নীলেন্দু বলল, "চল্, আমিও যাই।"

"রোদ কিন্তু খুব চড়া। তুই পারবি?"

"পারব চল্।"

শতদল বলল, "তুই বরং মৃগুর সাইকেলটা নে।"

নীলেন্দু বলল, "কোনো দরকার নেই, চল্।"

ঘরে ঢুকে পাখা পুরোপুরি করে খুলে দিল শতদল। বেশ গরম।

"বোস, আমি আসছি," শতদল বাইরে যাচ্ছিল।

"একটু জল আনিস," নীলেন্দু বলল।

চলে গেল শতদল। তিন বন্ধু যে যার মতন আরাম করে বসল।
শতদলের ঘরের জানলার ওপারে রোদের রঙ অন্যরকম দেখাচ্ছিল। গাছ-গাছালির পাতা আর ছায়ার জন্যে একটু সবুজ মেশানো। চড়ুই ডাকছিল। কোথাও বুঝি একটা টিয়াও লুকিয়ে আছে, কদাচিৎ ডেকে উঠছে।
জোছন জামার বুক পুরোই খুলে ফেলল। তার বোধহয় বেশি গরম লাগছে।
"তুই শেষ পর্যন্ত কী ঠিক করলি?" মৃগেন বলল নীলেন্দুকে। "টিউশানির?"
"ছেড়ে দেব। অসুখের সময় থেকে আর যাই নি।"
মৃগেন নীলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ক' মুহূর্ত। তারপর জোছনের দিকে তাকাল। জোছন কিছু বলল না।
মৃগেন বলল, "মাসীমাকে বলেছিস?"
"না, মাকে বলি নি কিছু।"
মৃগেন একবার জানলার দিকে তাকাল। এক জোড়া চড়ুই ফরফর করে উড়ে জানলায় এসে বসল, বসেই আবার উড়ে গেল।
জোছন বলল, "টিউশানি ছাড়লি। তারপর কী করবি?"
নীলেন্দু চশমার কাচ মুছতে লাগল। কোনো জবাব দিল না। অনেকক্ষণ পরে বলল, "দেশে আমাদের একটা বাড়ি ছিল। সেটা আমরা দেখশোনা করলাম না। ভেঙেচুরে পড়ে আছে। বাড়িটা থাকলে মাকে পাঠিয়ে দিতাম। বিলুকে নিয়ে থাকত। এখানে কী ভাবে থাকি দেখেছিস তো?"
"তোকে কী বললাম, আর কী জবাব দিচ্ছিস?"
নীলেন্দু ম্লান করে হাসল। "কী করব এখনও ভেবে দেখি নি।"
"আগে ভাব, তারপর টিউশানি ছাড়বি। মাসীমাকে তুই পথে বসাতে পারিস না। তোর একটা রেসপনসিবিলিটি আছে।"
নীলেন্দু মাথা নাড়ল। "নারে, মাকে পথে বসাতে চাই না। বিলুও রয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, যা আমি সত্যিই জানি না তা অন্যকে শেখাব কেমন করে। আমি নিজেও শিখি নি। এমনি গাইতাম। ভাল লাগত। শখের গাওয়া। কাউকে শেখাবার বিদ্যে আমার নেই।"
"তোর অনেস্টি ছাড়, নীলু," জোছন বলল, "আজকাল কেউ শিখে শেখায়

না। সবাই গোলে হরিবোল দেয়। এটা ফাঁকিবাজির যুগ, ভাই। দু পয়সা কামাও, পেট ভরাও। ব্যাস্। বোকার মতন টিউশানি ছাড়িস না।”

নীলেন্দু বলল, “ফাঁকিবাজি করতে চাই না বলেই ছাড়তে চাই। এই ফাঁকিবাজি কাঁহাতক ভাল লাগে।”

শতদল এল। কাচের জারে জল নিয়ে এসেছে। হাতে গ্লাস।

নীলেন্দু গ্লাস নিল। জল দিল শতদল।

মৃগেনও জল খেল।

নীলেন্দু বলল, “আমার কথা থাক। আমি অন্য একটা কথা বলতে এসেছি।”

শতদল তার বিছানায় গিয়ে বসল।

নীলেন্দু সামান্য চুপচাপ থাকার পর বলল, “সীতু, আমায় একটা চিঠি লিখেছিল। শুনেছিস?”

মাথা নাড়ল শতদল। “মৃগু বলছিল।”

নীলেন্দু মৃগেনের দিকে তাকাল। “তুই চিঠির কথা সব বলেছিস?”

“হ্যাঁ।”

“ভালই করেছিস।…গত পরশু সীতু আমার বাড়িতে এসেছিল। মা তখন ছিল না। আমি মাকে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। আসতে বলেছিলাম সীতুকে।”

জোছন চুপ করে শুনছিল। শতদল একবার জোছনকে দেখে নিল।

নীলেন্দু বলল, “আমি সব বলতে পারি, সীতু আমায় যা বলেছে।” বলে সে মৃগেনের দিকে তাকাল। “সীতু মৃগুর সামনে কথাটা না বলতে বলেছে।”

মৃগেনের চোখমুখ হঠাৎ গরম হয়ে উঠল। “আমি না হয় উঠে যাচ্ছি।”

শতদল বলল, “না। উঠবি না। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে আড়ালে কথা বলা আমি পছন্দ করি না। তেমন কথা যদি হয়—আমরা শুনব না।”

নীলেন্দু কেমন লজ্জা পেয়ে গেল।

“না, অবশ্য বলেছি, আমার যা বলার আমি মৃগুর সামনেই বলব আড়ালে নয়। মৃগুর জেনে রাখা উচিত।”

জানলার রোদ ঘরে ঢুকে টেবিলের দিকে সরে গেছে। বাতাবি লেবুর পাতার আড়ালে চড়ুইয়ের কিচকিচ। এক জোড়া প্রজাপতি উড়ছিল।

দোতলা থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাঁশরী কাকে ডাকল।

জোছন পকেট হাতড়াতে লাগল। সিগারেট খাবে।

নীলেন্দু বন্ধুদের মুখ দেখল। "সীতু বলল, ও সেদিন গোশালার কাছে কোথাও যায় নি। মদও খায় নি।"

ফস্ করে কাঠি জ্বালিয়ে জোছন বলল, "শালা বলল, চল্লু খায় নি? মিথ্যে কথা বলেছে।"

"তা জানি না। ও ওর মা-বাবার নামে দিব্যি করে বলল, ও নিজে কিছু খায় নি।"

"আঃ—। দুধের শিশু, অন্য লোক ওর মুখে ফিডিং বোতলে করে চল্লু গুঁজে দিয়েছে। এ-সব বাজে কথা তুই শুনলি। শালার পাছায় লাথি মারতে পারলি না?" জোছন খেপা গলায় বলল।

নীলেন্দু বলল, "তুই আচ্ছা শুরু করলি তো। সীতু যা বলেছে আমায় বলতে দে। বিশ্বাস করিস না করিস সেটা তোদের ব্যাপার।"

শতদল বলল, "জোছন, তোর এই একগুঁয়েমি আমার ভাল লাগে না। কথাটা শুনতে তোর আপত্তি কোথায়! তুই এত ইমপেশাণ্ট কেন। ছেলে-মানুষি করিস না।"

জোছন চটে গিয়ে বলল, "নে তবে শোন—। সীতু যুধিষ্ঠিরের গল্প শোন।"

মৃগেন কোনো কথা বলছিল না।

সামান্য অপেক্ষা করে নীলেন্দু বলল, "সীতু সেদিন মৃগুদের বাড়ি গিয়ে-ছিল।"

"আমাদের বাড়ি?" মৃগেন বলল, যেন প্রতিবাদ করে।

"তোদের ও-বাড়ি। তোর মেজোজেঠির কাছে। ও কয়েকটা কথা বলতে গিয়েছিল। ওদের ব্যাপারে।"

"ওদের ব্যাপারে মানে?"

"ওর আর পদ্মার ব্যাপারে।"

মৃগেনের কেমন যেন অস্বস্তি হল। চোখ সরিয়ে নিল। অবশ্য ব্যাপারটা বন্ধুদের অজানা নয়। তবু লজ্জা করছিল মৃগেনের।

নীলেন্দু মাথার চুল ঘাঁটল। যেন তারও বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল। নিচু গলায় বলল, "মৃগুর মেজোজেঠি সব শুনেটুনে ওকে যাচ্ছেতাই করেন। বোধ হয় হাতের কাছে জুতোটুতো পড়েছিল। তাই দিয়েও দু-চার ঘা বসিয়ে দেন।"

শতদল বলল, "কথাটা কী?"

"সীতু বলতে গিয়েছিল, ও পদ্মাকে বিয়ে করতে চায়।"

মৃগেনের হঠাৎ মনে পড়ল, বিষ্ণুদা সেদিন সীতুরা কোন জাত জানতে চাইছিল।

শতদল বলল, "বিয়ে।...তা বিয়ের কথা ও কেন বলবে। সীতুর মা বাবা আছে।"

নীলেন্দু চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলল, "এটা সে-রকম নয়। তা ছাড়া সীতুর বাবাকে তো জানিস। খুব বাজে ধরনের মানুষ। সকলের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি, অশান্তি, নানা দুর্নাম। সীতুর মা-ও সুবিধের নয়। ওরা আবার বামুন। তা সে-কথা যাক্। সীতু নিজেই বলতে গিয়েছিল, গিয়ে গালমন্দ খেয়ে ফিরে আসে।...সীতু বলছিল, ওর মন-মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। অপমানটা খুব লেগেছিল মনে। ও শিবুর দোকানে গিয়ে সেই ডেনজারাস ভাঙের গুলি খায়। গোটা চারেক। বাড়ি এসে বাবার সঙ্গে ঝগড়াও হয়েছিল। তারপর শেষ রাতে কী একটা হয়ে যায়—পয়জেনিংয়ের মতন।"

নীলেন্দু চুপ করল। বন্ধুদের মুখ দেখছিল।

জোছন গম্ভীর। চোখ মুখ রুক্ষ। মৃগেনকেও বিরক্ত, গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

শতদল ভয় পাবার গলায় বলল, "শিবুয়ার সেই ভাঙ-গুলি! বলিস কী! ও তো পাকা নেশুড়েরা খায়।"

জোছন বলল, "তোকে ছেড়েছে ভাল সীতু।"

শতদলই বলল, "প্রথমে শুনলাম বিষ, তারপর শুনলাম চল্লু, এখন তুই বলছিস ভাঙের গুলি!...কোনটা সত্যি?"

"কেমন করে বলব? সীতু যা বলেছে, বললাম।"

“তোর কী মনে হয় ?”
নীলেন্দু চশমার ডাঁটি কামড়াল। বলল, “সীতুর কথা শুনে মনে হল, ও সত্যি কথা বলছে।”
জোছন বলল, “মিথ্যে বলছে না তুই বুঝলি কেমন করে ?”
“আমার মনে হল সত্যি বলছে।”
“মনে হল।” জোছন বিদ্রূপ করে বলল, “মনে হলেই সেটা সত্যি হবে !”
মৃগেন কোনো কথাবার্তা বলছিল না। হঠাৎ বলল, “একটা কথা তা হলে বলি ! আমি পদ্মাকে সেদিন সকাল বেলায় হাসপাতালে যেতে দেখেছি। তখন বুঝি নি পদ্মা হাসপাতালে সীতুকে দেখতে যাচ্ছে। অনেক পরে শতোর বাড়িতে শুনলাম সীতু বিষ খেয়েছে। পানু এসে বলল।···পদ্মা কেমন করে জানতে পারল সীতু বিষ খেয়েছে ?”
নীলেন্দু বলল, “তা আমি জানি না। জিজ্ঞেস করি নি। তবে সীতু আমায় বলেছে—পদ্মা হাসপাতালে গিয়েছিল। সীতু তাকে দেখে নি। শুনেছে।”
জোছন উঠল। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল জানলা দিয়ে। জলের জার তুলে নিয়ে জল খেল আলগোছে। তার জামার বুকের কাছটা ভিজে গেল।
জল খেয়ে জোছন বলল, “সীতু তোকে আর কী বলেছে ?”
নীলেন্দু বলল, “বলেছে আরও অনেক কথা। বিষ্টুদা তাকে একদিন ধরে পেটে লাথিটাথি মেরেছে। টাকা কেড়ে নিয়েছে। বলেছে, এই শহর ছেড়ে চলে যেতে। নয়ত মেরে ফেলবে।”
“কেন ?”
নীলেন্দুর সমস্ত মুখ কেমন শুকনো হয়ে গেল। মৃগেনের দিকে তাকাল। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, “সীতু এখনও চেষ্টা করছে পদ্মাকে বিয়ে করার।”
“ভালবাসা ?” জোছন টিটকারির গলায় বলল।
“হ্যাঁ,” নীলেন্দু বলল, অস্বস্তির সঙ্গে, “পদ্মা মানে পদ্মার খুব বিপদ। ও··· মানে পদ্মার”···কথাটা শেষ করল না নীলেন্দু।
মৃগেনরা চমকে উঠল। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। বাইরে চড়ুই উড়ছে।

সেদিন সন্ধেবেলায় নয়, পরের দিন সকাল আর বিকেলেও মৃগেন বন্ধুদের কাছে গেল না। বাড়িতেই থাকল। তার ভাল লাগছিল না। কেতকীর বিকেল-ডিউটি শুরু হয়েছে, মন-টনও ভাল নয়, ভাইয়ের দিকে তার চোখ অতটা পড়ে নি। দয়াময়ীর পড়েছিল। সন্ধেবেলায় বাড়ি বসে থাকার ছেলে মৃগেন নয়। জিজ্ঞেস করেছিলেন ছেলেকে, মৃগেন শরীর খারাপের অজুহাত দেখাল। দয়াময়ী কী বুঝলেন কে জানে!

নীলুর মুখ থেকে না শুনলে মৃগেন অনেক কিছু জানতে পারত না। অন্তত এখন। সে বুঝতে বা ধরতেও পারে নি যে এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে তলায় তলায়। কাউকে জিজ্ঞেসও করে নি, করলেও জানতে পারত না। পদ্মাকে সে সেদিন সকালে ওভারব্রিজে দেখেছিল ঠিকই, কিন্তু পদ্মা কোথায় যাচ্ছে সে জানত না। দিদির মুখেই শুনল, পদ্মা হাসপাতালে সীতুকে দেখতে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল মৃগেনের জানার কথা নয়। সেই রকম, ক' দিন আগে বাড়ি এসে শুনল, মেজোজেঠি এসেছিল। মৃগেন অবাক হয়েছিল বুঝতে পারে নি হঠাৎ মেজোজেঠি কেন এসেছিল? মা বা দিদি তাকে খবরটাই দিয়েছিল শুধু, কারণটা বলে নি। 'এই বেড়াতে এসেছিল। দেখতে এসেছিল আমরা কোথায় এসে উঠেছি।'

আজ মৃগেন অনেক কিছু বুঝতে পারছে। পদ্মার ওই রকম দিশেহারা হয়ে ছুটে যাবার কারণটা তার আর অজানা থাকছে না। সে বুঝতে পারছে, মেজোজেঠি এ-বাড়িতে বেড়াতে আসে নি; মা আর দিদিকে গালাগাল দিতে এসেছিল। বলতে এসেছিল, ওই তোমাদের নচ্ছার ছেলের বন্ধু আমার বাড়িতে এসে আমাদের সর্বনাশ করে গেছে। কী ছেলেই পেটে ধরেছ ছোটো। নিজের ঘরবাড়ি। বংশের মুখে কালি দিল। ওই হারাম-জাদাই তো তার বন্ধুকে বাড়িতে ঢুকিয়েছিল।

মেজোজেঠির মুখ মেজাজ কোনোটাই ভাল নয়। সবই বলতে পারে মেজো-জেঠি। নিশ্চয় বলেছে। আর কথাগুলো মা বা দিদির কানে ভাল শোনায় নি। শোনাবার কথাও নয়। এই যে বাড়িতে চুপচাপ থমথমে ভাব চলছে, মা গম্ভীর দিদি গম্ভীর—কেউ তেমন কোনো কথাবার্তাও বলে না—সেটা

ওই কারণেই। মৃগেনকে নিয়ে মা আর দিদির মধ্যে অশান্তি হয়েছে। এ-ছাড়া আর কী হতে পারে?

কপালটা সত্যিই খারাপ মৃগেনের। সে কোনো কিছুর মধ্যে থাকল না, জানল না—অথচ দোষী হয়ে গেল। এটা ঠিক, সীতু তার বন্ধু। অনেক-কালের বন্ধু। মৃগেনের সুবাদেই সে ও-বাড়িতে আসত যেত, অন্যদেরও পরিচিত হয়েছিল। এই বন্ধুত্ব পুরনো হলেও আজকাল সেটা আর তেমন গভীর ছিল না। বরং পলকা হয়ে এসেছিল। ছেলেবেলার সব বন্ধুই কি শেষ পর্যন্ত বন্ধু থাকে! সীতুও ছিল না। সীতু মৃগেনের চেয়ে দু এক বছরের বড়, স্বভাবও ভাল নয়। বকা-ধরনের ছেলে। ওর অন্য রকম মতিগতি ছিল। যাই হোক, মেলামেশা আড্ডা থাকলেও গলাগলি তেমন ছিল না আর। সীতু কোন অফিসে একটা চাকরিও পেয়ে গেল। তার অন্য পাঁচটা বন্ধুও জুটল বেপাড়ার। মৃগেন অত খোঁজ রাখে নি, রাখার দরকারও ছিল না।

মেজোজেঠি যদি এখন ধরে বসে থাকে, যা হয়েছে—সব মৃগেনের জন্যে তবে সেটা অন্যায়। মৃগেনের জন্যে কিছু হয় নি। তোমার মেয়ে যদি সীতুর সঙ্গে ভালবাসা-বাসি করে মৃগেন কী করতে পারে! তোমার মেয়েকে তুমি জান না? ডুবে ডুবে জল খাওয়া মেয়ে। বাইরে কেমন গোবেচারী ভাব—কিন্তু ভেতরে বজ্জাত। বড় দেমাকী মেয়ে। নিজের গড়ন আর মাথার চুল নিয়ে মস্ত রূপসী ভাবত নিজেকে। পাড়ার বাজে মেয়েরা ছিল ওর বন্ধু। আড়ালে আড়ালে গল্প। ছাদে বসে চিঠি পড়া, ছবি দেখা। সীতুকে দোষ দিয়ে লাভ কী! তোমার মেয়েও কিছু কম?

তবে এসব যাই হোক, মৃগেন আজ নিজেকে অপমানিত, বিব্রত বোধ করছে। মা আর দিদির কাছে তার আর মুখ তোলার উপায় নেই। বন্ধু-রাও মৃগেনকে দেখে মজা পাচ্ছে। মল্লিকবাড়ির ছেলে মৃগেন, সেই বাড়িতে কী কেচ্ছাই না ঘটল। এ-কথা চাপা থাকবে না, সারা শহর রটে যাবে। ছি ছি।

সীতুর ওপর মৃগেনের যত রাগ, তত ঘেন্না হচ্ছিল। তুমি শালা শেষ পর্যন্ত

একটা ভদ্রবাড়ির মেয়ের এত বড় সর্বনাশ করলে! জীবন নষ্ট করলে মেয়েটার। আবার থিয়েটারী মারছ, পদ্মাকে বিয়ে করতে চাও। মল্লিক-বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করার যোগ্য তুমি? চোয়াড়ের মতন দেখতে, নেশা-খোর, বাড়িতে ওই বাপ-মা, তুমি শালা কোন কেরামতি দেখিয়ে বিয়ে করবে পদ্মাকে। মল্লিকবাড়ি আজ ভিখিরি, তার ঠাট গিয়েছে, ঠমক ঘুচেছে—তবু তার ভেতরের ইজ্জত আছে। কেন তোমায় মেয়ে দেবে মেজোজেঠি? তোমার কী আছে?

মৃগেন কোনো ভাবেই নিজের উত্তেজনা, দুঃখ, গ্লানি মুছতে পারছিল না। সে অন্যভাবে ভাববার চেষ্টা করেছে, নিজেদের বাড়ির অন্য অনেক লুকনো কীর্তি ও কেচ্ছার কথা ভেবে নিজেকেই বোঝাতে চেয়েছে—মল্লিকবাড়ির ভেতরে নোঙরামির অভাব নেই। যখন সুদিন ছিল তখন নাকি জেঠারা ফূর্তি উড়োতে কম যেত না। বহু রকম কেত্তন গেয়েছে বাবু-বিবিরা। কাজেই এটা একেবারে নতুন নয়। কী হবে বাড়ির ইজ্জ-তের কথা ভেবে, কেন সে ও-বাড়ির মেয়ে-বউয়ের মান-সম্মানের সঙ্গে নিজেকে জড়াবে। ওরা যেমন ছিল, তেমনই আছে। মৃগেনের কিছু আসে যায় না। আর সীতু কী করল না করল তাতেই বা কী, বন্ধুর শয়তানির দায়িত্ব তার নয়।

মৃগেন যেমন করেই ভাবুক—তার ভাল লাগছিল না। অস্থির, বিমর্ষ হয়ে উঠছিল।

দিন দুই পরে শেষ বিকেলে শতদল আর জোছন এসে হাজির।

“কিরে, তুই ডুব মেরে দিলি যে। দু দিন দেখা নেই। ব্যাপার কী?”

“কিছু না। ভাল লাগছিল না। বাড়িতেই ছিলাম।”

বন্ধুরা ভাল না-লাগার কারণটা জানে। বলল না কিছু।

দয়াময়ী পাশের কোয়ার্টারে কোনো কাজে গিয়েছিলেন। বাড়ি এসে শতদলদের দেখলেন।

শতদল বলল, “বেড়াতে এলাম কাকিমা। আসব আসব করেও আসা

হচ্ছিল না।”

জোছন বলল, “জায়গাটা খুব সুন্দর কাকিমা। ফাঁকা। ভালই হয়েছে। কেতুদি কোথায় ?”

“অফিসে। তোমাদের বাড়ির সব খবর কী ?”

“খারাপ নয়। আপনি কেমন আছেন ?”

“ভালই আছি। নীলু এল না ?···ও তো সেরে উঠেছে শুনলাম।”

“নীলুর সঙ্গে দেখা হয় নি আজ। আমরা হঠাৎ চলে এলাম।”

“বসো। চা খাও।”

“একটু বসছি। তারপর বেড়াব এখানে।”

দয়াময়ী ছেলের বন্ধুদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

শতদল বলল, “তুই যেন শুকনো মেরে গিয়েছিস রে !···চল চা খেয়ে বাইরে যাই।”

বাইরে এসে তিন বন্ধুই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। হাঁটল খানিকটা। সন্ধে হয়ে আসছে। চাঁদের আলো ফুটে উঠছিল ঘন হয়ে।

শতদলই কথা বলল প্রথমে, “যাই বলিস, জায়গাটা কিন্তু দারুণ।”

মৃগেন কোনো জবাব দিল না কথার।

জোছন বলল, “মৃগু, ট্যাংকে মাছ আছে ? আগে লোকে এখানে মাছ ধরতে আসত।”

মৃগেন বলল, “এখনও আসে। কম।”

“বাবার খুব মাছ ধরার শখ ছিল। আগে আসত। বুড়ো এখন শখটখ ছেড়ে দিয়েছে। সন্ধেবেলায় দেখি ভাগবত পড়ে।”

শতদল ঠাট্টা করে বলল, “তোর মতন বংশধর থাকলে ভাগবত না পড়ে উপায় কি ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর কি।”

জোছন বলল, “খচড়ামি করিস না, শতো। আমার মতন পিওর ক’টা পাবি।”

শতদল ফাজলামি করে জোছনের থুতনি নেড়ে দিয়ে নিজের আঙুলে চুমু

খেল। "রাজা আমার ! সতী সাবিত্রী !"

হাসাহাসি হল। মৃগেন হাসল না।

ঝিলের কাছে এসে বসল তিন জনে। হাত পা ছড়িয়ে। একটা এঞ্জিন রেল ইয়ার্ড থেকে গোটা দুই মালগাড়ি নিয়ে বেখেয়ালে চলে এসেছিল বোধ হয়, আবার ইয়ার্ডে ফিরে যাচ্ছে।

শতদল সিগারেটের প্যাকেট বার করল। নতুন প্যাকেট। বলল, "জোছন, একটা টাকা দিবি ?"

"কেন ?"

"তোকে রিকশা চাপিয়ে আনলাম। সিগারেট খাওয়াচ্ছি।"

"তুই শালা তেলেভাজার দোকান কর। ব্যবসা তোর দ্বারা হবে না।"

মৃগেন বন্ধুদের কথাবার্তায় একটুও হাসছিল না। চুপচাপ।

সিগারেট বিলি করল শতদল। ধরানো হল। তারপর শতদল বলল, "তুই এত গম্ভীর কেন রে, মৃগু ? বাড়িতে কিছু হয়েছে।"

মাথা নাড়ল মৃগেন।

"কী হয়েছে তোর ?"

এবারও কোনো জবাব দিল না মৃগেন।

একটু চুপ করে থেকে শতদল আবার বলল, "নীলু আসব বলেছিল। তারপর বলল, না আমি আর যাব না। মৃগু আমায় ভুল ভাবছে। আমি ওকে অপমান করার জন্যে কিছু বলি নি।"

মৃগেন বলল, "আমি কখন বলেছি নীলু আমায় বেইজ্জত করেছে !"

"তুই বলিস নি। নীলুর নিজেরই লজ্জা করছে।...ক্ষমা চেয়েছে তোর কাছে।"

চুপচাপ থাকল মৃগেন। শতদলও কথা বলল না।

জোছন বলল, "আমি সীতুর হোয়ার অ্যাবাউটস নেবার জন্যে সোলজার ফিট্ করে দিয়েছি, বুঝলি ! দু-একটা খবর জানতে পেরেছি। বাড়িতে বাপের সঙ্গে জোর খচাখচি লেগে গেছে। ও বোধহয় বাড়ি ছেড়ে দেবে।...ওর অফিসে তিলক আছে। তিলক বলছিল, সীতু নাকি কোন্

কোলিয়ারিতে পালিয়ে যাবার জন্যে খুব ধরেছে।"

"এখান থেকে কেটে পড়াই ভাল," শতদল বলল।

জোছন বলল, "বিষ্টুদা ওকে নজরে রেখেছে।"

"কেন?" মৃগেন জিজ্ঞেস করল।

"বলতে পারি না।"

মৃগেন হঠাৎ রুক্ষভাবে বলল, "সীতুকে পেলে আমিই হয়ত মেরে বসব।"

শতদল বা জোছন কোনো কথা বলল না।

সিগারেটের টুকরোটা টোকা মেরে অনেকটা দূরে ফেলে দিল জোছন। দিয়ে মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়ল আকাশ-মুখো হয়ে।

শতদল বার কয়েক মৃগেনের মুখের দিকে তাকাল। এবার সন্ধের প্যাসেঞ্জার গাড়িটা আসছে। বাঁকের ওপারে শব্দ উঠছে। চোখের পলকে এঞ্জিন দেখা দেবে। কালভার্টের ওপর গাড়ি ওঠার আওয়াজ হচ্ছিল। শতদল কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলল না। ট্রেনটা চলে যাক।

ঝিলের ওপার দিয়ে গাড়িটা চলে গেল স্টেশনের দিকে। জানলার আলোগুলো যেন লাফাতে লাফাতে চোখের সামনে দিয়ে মিলিয়ে গেল।

শব্দ মেলাতেই দূর থেকে ঢোলোক আর ঝম্পর হল্লা।

শতদল এবার বলল, "তোর বাড়িতে কিছু জানে?"

মৃগেন শতদলের দিকে তাকাল। "জানে মানে! নিশ্চয় কিছু জানে। দিদির কানেই প্রথম খবর পৌঁছেছিল পদ্মা সীতুকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিল। আমিই তো পরে জানলাম। দিদি সেদিন আমার ওপর এক হাত যা নিয়েছিল!" একটু থেমে মৃগেন সিগারেট নিবিয়ে দিল পায়ে ঘষে। আবার বলল, "মেজোজেঠি আমাদের এই বাড়িতে ক'দিন আগে হঠাৎ এসে হাজির হয়েছিল। কেন জানি না। তার পর থেকে মা আর দিদি কথাবার্তাই বলছে না। কী জানি মেজোজেঠি কী বলে গেছে! আমার বারোটা বাজিয়ে গেছে আর কি?"

শতদল কান চুলকোতে লাগল।

তিন জনেই চুপচাপ। জোছন আকাশের চাঁদ দেখছে যেন। চমৎকার বাতাস

বইছিল। শতদল কাত হয়ে শুয়ে মাটিতে হাত বোলাতে লাগল।
শেষকালে জোছন বলল, "মৃগু, আমার একটা কথা আছে।"
মৃগেন জোছনের মুখের দিকে তাকাল। চাঁদের আলো পড়েছে জোছনের মুখে। ঘাসের ডাঁটি ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে চিবুচ্ছে জোছন। "কথাটা বলব?"
কী কথা অনুমান করতে না পেরে মৃগেন কিছুই বলল না।
শতদলও অপেক্ষা করছিল।
"তোর বলাইদাকে মনে পড়ে! সেই কেস!"
মৃগেনের মনে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।
জোছন বলল, "বলাইদার কেসেও এই রকম হয়েছিল। বেলাদির শেষ পর্যন্ত কী অবস্থা হল! কেরসিন তেল লাগিয়ে পুড়ে মরল।"
শতদল কেমন ভয়-আতঙ্কের শব্দ করল। "আমি ভাই সেই চেহারা এক পলক দেখেছি। চার পাঁচ দিন ঘুমোতে পারি নি। মানুষ আগুনে পুড়ে মরলে এত বীভৎস হয়! হরিবল।"
জোছন বলল, "তোর মেজোজেঠি বোকামি করছে। বিয়েটা দিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল।"
"বিয়ে! সীতুর সঙ্গে! কী বলছিস?"
"আমি প্র্যাকটিকাল কথা বলছি।"
মৃগেন খেপে গেল। "একটা লোচ্চা লোফার নেশুড়ের সঙ্গে বিয়ে! তোর কি মাথা খারাপ! সীতু একটা রাস্কেল, সোয়াইন।"
জোছন কোনো জবাব দিল না। যেন মৃগেনের চড়া মেজাজ কিছুটা নরম হবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।
শতদলও চুপচাপ থাকল। শুকনো মাঠে গন্ধ জমে উঠছে। ঝিলের দিক থেকে জোনাকি উড়ে এল এক মুঠো।
মৃগেন বলল, "সীতুর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া আর পাথর বেঁধে মেয়েকে জলে ফেলে দেওয়া সমান।"
জোছন বলল, "ঠিক। কিন্তু এই কেসটা আলাদা।"
"মানে?"

"মান সম্মান বাঁচাতে হলে অন্য পথ নেই।"

"মুখ্যুর মতন কথা বলিস না। সীতুর সঙ্গে বিয়েতে মান-সম্মান বাঁচবে?"

"খানিকটা।...বিয়ের পর কী হল না-হল তা নিয়ে লোকে অত মাথা ঘামাবে না। হয়ত ভেতরের এই কেচ্ছা চাপা পড়ে যাবে। লোকের মেমারি শর্ট, দু চার বছর পরে এত কথা মনেও রাখবে না।"

মৃগেন জোরে মাথা নাড়ল। উত্তেজিত গলায় বলল, "না। মল্লিকবাড়ির মেয়েকে ও-শালা কাপড়ের দোকানের দোকানদাররা বিয়ে করবে কোন এলেমে? তা ছাড়া ওরা বামুন।"

জোছন আবার চুপ করে গেল।

শতদল বলল, "বামুন-কায়েত কোনো ফ্যাক্টর নয়, মৃগু। না মানলেও চলে। এ-সব জাতটাত এখন মানামানির দরকার করে না।"

"বাজে বকিস না। তুই করবি?"

"কেন করব না! আমার মামা করেছে।"

মৃগেন কেমন রাগের মাথায় বলল, "কী ব্যাপার বল তো? সীতুর হয়ে তোরা দালালী করছিস! সীতু বুঝি তোদের দালাল ধরেছে?"

শতদল কিছু বলার আগে জোছন বলল, "ব্যাস! আর কোনো কথা নয়। তুই যদি তাই ভেবে থাকিস আর-একটাও কথা বলব না।...শতো, স্টপ ইট।"

কী হল স্পষ্ট বোঝা গেল না, আচমকা এক নীরবতা এবং গুমোট যেন মৃগেন এবং তার বন্ধুদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

মৃগেন সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। কেমন এক অস্বস্তি ক্রমশই যেন তাকে বিব্রত কুণ্ঠিত করে তুলছিল। সে কি অন্যায় করল? জোছন কি চটে গেল! শতদল রেগে গিয়েছে! আড়চোখে জোছনকে দেখল। আগের মতনই শুয়ে জোছন। শতদল ঝিল দেখছে।

সন্ধে হয়ে গিয়েছে কখন। মাঠজোড়া জ্যোৎস্না, যেন সমস্ত কিছু চাঁদের আলোয় ডোবানো। দূরে টিলাটা মেঘের মতন কালো হয়ে দাঁড়িয়ে। কখনও বাতাসে সামান্য ধুলো উড়ছে, মেঠো গন্ধে চারদিক ভরা।

জোছন হঠাৎ উঠে বসল। "শতো, নে ওঠ। হাঁটতে হবে…।"
মৃগেন বলল, "মানে!…মেজাজ দেখাচ্ছিস ?"
"না।"
"আমি কী বলেছি যে তুই এত চটে গেলি ? এটা অন্যায়।"
"তুই যা বলার বলেছিস! আমি চেঁচাতে চাই না।…নে শতো, ওঠ। নয়ত তুই বোস আমি যাই। আমার কাজ আছে।"
মৃগেন বিমূঢ়। জোছন উঠে দাঁড়িয়েছে। শতদল তখনও ওঠে নি।
"জোছন! তুই আমায় ভুল বুঝছিস।"
জোছন মৃগেনের দিকে তাকাল না। "শতো, তুই উঠবি, না, আমি যাব ?"
শতদল যেন দোটানায় পড়ে উঠতে উঠতে বলল, "তুই ঝপ করে এমন করিস।"
মৃগেন হাত বাড়াল। "জোছন, খুব অন্যায় হচ্ছে এটা। আমি সত্যিই তোদের…"
"সত্যিমিথ্যে জানি না। আমি যা বলার খোলাখুলি বলি। যখন বলি না তখন দেওয়ালকেও বলি না মৃগেন। সীতু আমায় খাওয়াবে ? আমি ও হারামির পয়সায় খাব। সীতু তোদের বন্ধু, আমার নয়। আমি ওকে অনেকদিন ধরেই অ্যাভয়েড করি। সবাই জানে। আই হেট্ হিম।"
শতদল উঠে দাঁড়াল। "তোরা একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে…"
"তোমার কাছে সামান্য আমার কাছে নয়", জোছন বলল, "আমি সীতুকে চিনি, আর ওই মল্লিকবাড়িও চিনি। সত্যি কথা বলতে গেলে কানে খারাপ শোনাবে।…নে, চল। ফরনাথিং চটাস না।"
মৃগেনও দাঁড়িয়ে পড়ল। "তুই মল্লিকবাড়ি চিনিস ?"
"খানিকটা চিনি।"
"কী চিনিস ?"
"ঝগড়া করতে চাস ?"
শতদল দুজনের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে পড়ল। "কী হচ্ছে! তোদের এত মাথা গরম কেন ? গরমির রোগ হবে বেটা।…এই মৃগু, তুই চুপ কর।

জোছন, বিটুইন ফ্রেণ্ডস নো ফাইটিং।"
"আমি ফাইটিং করছি না।···আমি আমার স্বার্থে এখানে আসি নি। আমি বিয়ে করতে চেয়েছি পদ্মাকে, না, সীতু আমার ভায়রাভাই!···আমার যেটা ভাল মনে হয়েছে, মৃগুদের হিউমিলিয়েশান বাঁচে, সেটা বলছিলাম। ও আমায় সীতুর দালাল ভাবল।"
মৃগেন বুঝতে পারছিল সে বোকামি করে ফেলেছে। ইচ্ছে করে নয়। মুখ ফসকে একটা কথা বেরিয়ে গিয়েছে রাগের মাথায়।
মৃগেন বলল, "অদ্ভুত কাণ্ড! আমি ইচ্ছে করে কিছু বলেছি! মানুষের মুখ থেকে একটা কথা বেরিয়ে যায় না? বাঃ! এই যে জোছন মল্লিকবাড়ির কথা বলল···সেটাও তো ইনসাল্ট।"
শতদল জোছনকে সরিয়ে দিল ধাক্কা মেরে। "চল। আর গুঁতোগুঁতি করতে হবে না। দামড়া, ইডিয়েট কোথাকার···মৃগু, আর নয়।"
শতদল জোছনকে নিয়ে কয়েক পা এগুতেই মৃগেন বলল, "জোছন, একটা কথা।"
জোছন দাঁড়াল।
"আমি মল্লিকবাড়ি নই। মল্লিকবাড়ির একজন। মেজোজেঠি আমার কথায় মেয়ের বিয়ে দেবে না। তার মেয়ে সে যা ভাল বুঝবে করবে।" মৃগেন ঠাণ্ডা গলায় বলল।
জোছন বলল, "আমারও একটা কথা। আমি সীতুর দালাল নই। সে-শালাকে হাতের কাছে পেলে জুতিয়ে গায়ের ছাল তুলতাম। কিন্তু মল্লিক-বাড়ির রোয়াবি আমার কাছে করে কোনো লাভ নেই। সোনার পকেট ঘড়ি আমার ঠাকুরদারও ছিল, সে-ঘড়ির দাগও এখন দেখা যায় না।··· তুই কিসের মল্লিকবাড়ি দেখাচ্ছিস? তোর বাড়ির যে অত ইজ্জত, কেতুদি কেন চলে এল ও-বাড়ি ছেড়ে? কেন তুই এলি? বল্—? কেন কেতুদি চাকরি করে? তোর সেজো জেঠা সাইকেলের দোকান করে বসে আছে বাজারে, আর তুই সেখানে জন্মেও চাকার হাওয়া নিতে যাস না। কেন? তুই শালা নিজেও তোর মল্লিকবাড়িকে ঘেন্না করিস।"

মৃগেন চুপ। তার বলার কিছু নেই। দিদি যে কত ঘেন্না করে ও-বাড়ি মৃগেন জানে। সেও কম ঘেন্না করে না। তবু কী যেন রয়েছে ওখানে, কোনো অহঙ্কার, আভিজাত্য বোধ, কেমন যেন মায়া।

শতদল জোছনকে ঠেলল।

চলে যাচ্ছিল ওরা। মৃগেন বলল, "ঘেন্না করলে একটুও ভালবাসা যায় না?"

জোছন আবার দাঁড়াল। কী যেন বলল শতদলকে, তারপর মৃগেনের দিকে এগিয়ে এল। পেছনে পেছনে শতদল।

জোছন দু মুহূর্ত মৃগেনের চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "হয়ত যায়। সে-ঘেন্না তোর নেই। ভালবাসাও নেই। তুই কিছু পাস নি বলে ঘেন্না করিস। ভালোও বাসিস ওই রকম, দশ হাত দূর থেকে, শখ করে, বাঁশিকে যেমন বাসিস!"

মৃগেন কেমন চমকে উঠল।

জোছন বলল, "কাকিমাকে জিজ্ঞেস করবি—বুঝতে পারবি ভালবাসা কাকে বলে।"

শতদলকে সরিয়ে দিয়ে জোছন হাঁটতে লাগল। শতদল একবার যেন দেখল মৃগেনকে, তারপর জোছনের সঙ্গী হবার জন্যে পা বাড়াল।

মৃগেনের পা আর নড়ছিল না।

কেতকীর বাড়ি ফিরতে খানিকটা দেরি হল।

দয়াময়ী প্রথম প্রথম উদ্বেগ বোধ করতেন। এতটা ফাঁকা পথ, একা একা আসে মেয়ে, হোক না কেন রিকশায়, তবু এ-সব জায়গা এমন কিছু ভালও নয়, একটা বিপদ তো ঘটতেই পারে। এখন আর অতটা উদ্বিগ্ন হন না। সবই সয়ে যাচ্ছে।

আজ কিন্তু বেশ দেরি করল কেতকী। দয়াময়ী ঘড়ি দেখেছেন আগেই। তাঁর খুশী হবার কথা নয়। কিন্তু কিছু বললেন না।

কেতকীও কোনো কৈফিয়ত দিল না।

কাপড়জামা বদলাতে, গা হাত ধুতে আরও খানিকটা সময় গেল। দয়াময়ী উঠোনে মোড়ায় বসে অপেক্ষা করছিলেন সমানে। মেয়ে বাড়ি ফেরার পর থেকে তাঁর সঙ্গে গোনাগুনতি চার পাঁচটা কথা হয়েছে, তাও মামুলী। কেতকী যখন কলঘর থেকে ফিরে এল দয়ামযী উঠলেন। খাবার বাড়তে হবে।

রান্নাঘরের পাশে ঢাকা বারান্দায় খাওয়ার ব্যবস্থা। কেতকী নিজেই আসন পেতে নিল। জল নিতে নিতে বলল, "মৃগু কোথায় ?"

"শুয়ে পড়েছে।"

"শুয়ে পড়েছে। কেন ?"

"শরীরটা ভাল নয়। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ল।"

"ও।"

কেতকী আর কিছু বলল না। এক সঙ্গে খেতে বসে তুজনে। আসনও পেতেছিল তুটো। জলও গড়াচ্ছিল তু গ্লাস।

কেতকী নিজের জায়গায় বসল। মা সব কাজ কর্ম তুলে, হেঁসেল ধুয়ে, কাপড় বদলে খেতে বসবে। মাছ, পিঁয়াজ, ডিমের ছোঁয়াছুঁয়ি কাপড়ে মা খেতে বসে না।

খেতে বসে কেতকী বলল, "বাড়ি ঢুকেছে কখন ?"

দয়াময়ী কথাটা ধরতে পারেন নি প্রথমে। পরে বুঝতে পারলেন। "ও কোথাও যায় নি। বাড়িতেই ছিল। বিকেলে শতোরা এসেছিল ?"

কেতকী কেমন অবাক হল। আজ দিন তুই সকালেও সে মৃগেনকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যেতে দেখছে না। সাইকেল খারাপ হয়েছে বলে নাকি বেরুচ্ছে না, স্টেশনের এপারে ছোট্ট বাজার বসে—সেখান থেকে বাজার এনে দিচ্ছে। বিকেলের খবর কেতকী জানত না। জিজ্ঞেসও করে নি। তবে সে লক্ষ্য করেছে, মৃগেনের হাঁকডাক, লাফালাফি কমে গেছে। চুপচাপ থাকে। ঘরে বসে নিজের মনে কী করে কে জানে।

খেতে খেতে কেতকী বলল, "কে কে এসেছিল ?"

"শতো আর জোছন।"

কেতকী আর কিছু বলল না। তার এখন কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। ভাইয়ের স্বভাব সে জানে। ছেলেবেলার দুরন্তপনা বাদ দিলে মৃগেন কোনো দিনই দুর্দান্ত ছিল না। সে শান্ত গোছের। বন্ধু-বান্ধব-অন্ত প্রাণ। ভীষণ আড্ডা-বাজ। ও-বাড়িতে থাকতে তার টিকি কমই দেখা যেত বাড়িতে। সারাদিন বন্ধু আর বন্ধু। কেতকী অনেক গালাগাল দিয়েও এই অভ্যেস ছাড়াতে পারে নি। এ-বাড়িতে এসেও মৃগেনের আড্ডা বন্ধ হয় নি। আড্ডার সময় একটু কমেছিল এই যা। কেতকী অনেক দিন বলেছে, এই তুই বাজার করে ফিরলি, আবার ছুটলি আড্ডা মারতে, দু বার করে সাইকেল চালিয়ে শহরে ছুটিস কেন? বিকেলে তো বকামি করতে রোজই যাস।···কেতকী বলেছে, কিন্তু কে কার কথা শোনে!

কেতকীর সন্দেহ হচ্ছিল, নিশ্চয় কিছু ঘটেছে। নয়ত মৃগেন আড্ডা বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকবে কেন? কিন্তু কী ঘটেছে।

মৃগেনের বন্ধু-বান্ধবদের সকলকেই চেনে কেতকী। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। আগে একেবারে বন্ধুর হাট ছিল, ধীরে ধীরে সে-হাট ভেঙে অল্প ক'জনে দাঁড়াল। শতদল, জোছন, নীলেন্দু, সীতু, পান্নু—এইসব। তবে আজকাল সীতুর নাম আর বেশি শোনা যেত না মৃগেনের মুখে। কেতকী অবশ্য ও-বাড়িতে সীতুকে প্রায়ই দেখত। মৃগেনদের ঘরের দিকে সে আসত না, দোতলায় মেজোজেঠিদের ঘরের দিকে চলে যেত।

এটা ঠিক, কেতকী তার ভাইয়ের বন্ধুদের কোনো দুর্নাম করতে পারবে না। সবাই ভদ্রবাড়ির ছেলে, লেখাপড়াও করেছে মোটামুটি, চাকরি-বাকরিও করে কেউ কেউ, কেউ বা আবার মৃগেনের মতন বেকার। এই বয়সে ছেলে-দের যা হয়, আড্ডা, চায়ের দোকানে গজল্লা, বকামি, ফাজলামি—এ-সবের কোনোটাই মৃগেনের বন্ধুদের বাদ ছিল না। কেতকী তা জানে। এটা দোষের বলেও সে মনে করে না। কিন্তু কুয়ার মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দিলে আর ওঠা যায় না। মৃগেন যদি ধীরে ধীরে সেই ভাবে ডুবে যায়, কী হবে! এ-রকম যে কেউ যায় নি তাও নয়, হীরু বলে একটা ঝকঝকে ছেলে

ছিল, রেলের অ্যাকাউন্টস অফিসারের ছেলে। ছেলেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। কেতকী এখনও তাকে মাঝে মাঝে দেখতে পায়—রিকশা স্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন পাগল পাগল ভাব, হলুদ চোখ-মুখ। গাঁজার নেশা করে করে ছেলেটা শেষ হয়ে গেল।

কেতকী চায় নি তার ভাই হীরু, মণ্টু বা বিশুর মতন হয়ে যাক। কেউ জোর করে বলতে পারে না—মৃগেন ও-রকম হবে না। দিনকাল বড় খারাপ। খুব খারাপ। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা মুশকিল।

খাওয়া শেষ করে কেতকী থালা উঠিয়ে রান্নাঘরের একপাশে রেখে দিতে গেল।

খাওয়া শেষ করে কেতকী থালা উঠিয়ে রান্নাঘরের একপাশে রেখে দিতে গেল।

মুখটুখ ধুয়ে হাত মুছে কেতকী ঘরে গেল। বাইরে এল আবার। মুখে এলাচ-লবঙ্গ। কী মনে করে মৃগেনের ঘরে ঢুকল। দরজা দেয় নি মৃগু। দিদি ফেরার পর সব শেষ হলে দরজা বন্ধ করে সে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। পরে মা ডাকলে জেগে উঠে দরজা বন্ধ করবে।

ঘরে বাতি জ্বলছিল না। মৃগেন পাশ ফিরে কুঁকড়ে শুয়ে আছে।

ডাকব কি ডাকব না করে কেতকী ডাকল, "ভাই!"

প্রথমে সাড়া নেই। তারপর মৃগেন নড়েচড়ে উঠল।

"কি রে, ঘুমোচ্ছিস?"

"না।"

কেতকী চৌকাঠের কাছ থেকে সরে বিছানার কাছে গেল। "তোর কী হয়েছে। মা বলছিল, শরীর খারাপ।"

মৃগেন মৃদু গলায় বলল, "এমনি। মাথা ধরেছে।"

"তা হলে জেগে আছিস কেন! দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়।"

কোনো জবাব দিল না মৃগেন। না দিলেও বোঝা গেল, দিদি বাড়ি ফেরে নি, সে কেমন করে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়বে।

কেতকী দু পা এগিয়ে মৃগেনের বিছানার পাশে বসল। "আজ শতোরা

এসেছিল ?"

"হ্যাঁ," মৃগেন একটু সরে গেল। দিদি তার পায়ের কাছে বসে আছে। সঙ্কোচ হচ্ছিল।

"তুই আজকাল শতো-জোছনদের কাছে যাস না ?"

"দু দিন যাই নি।"

"কেন ?"

"আমার সাইকেল খারাপ। এতটা রাস্তা হেঁটে হেঁটে যেতে ভাল লাগে না।" মৃগেন নীচু গলায় বলল।

কেতকীর বোধ হয় মজা লাগল। "ঝগড়াঝাটি হয় নি তো ?"

মৃগেন একইভাবে শুয়ে থাকল। "না।"

"সত্যি বলছিস ?"

"বাঃ, ঝগড়া হলে ওরা আসবে কেন আমার বাড়িতে !"

"ভাব করতে," কেতকী হেসে ফেলল, "বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া আর ভাব হয় না ?"

মৃগেন কোনো জবাব দিল না।

কেতকী এবার ভাইয়ের পায়ে ছোট্ট করে চিমটি কাটল। "তোর মতন আড্ডাধারী, বন্ধুমুখো ছেলে গ্যাঁট হয়ে বাড়িতে বসে আছিস দু দিন ধরে এমনি এমনি—এ আমায় বিশ্বাস করতে বলিস! তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।"

"বলছি তো আমার সাইকেল খারাপ, চড়া যাচ্ছে না—। অতটা রাস্তা ক'বার করে হাঁটব !" মৃগেন এবার বিরক্ত হচ্ছিল।

কেতকী ভাইয়ের গলা শুনে বুঝল, মৃগেন রেগে যাচ্ছে। একটু চুপ করে থাকল। "তোকে যদি একটা সাইকেল কিনে দি।"

মৃগেন অবাক। সাইকেল ! একটা সাইকেলের দাম জানে দিদি? মোটামুটি কিনতে হলেও শ' চারেক। সস্তা হলে তিন শ'। তিন শ' চার শ' টাকা কোথায় পাবে দিদি ? কত টেনেটুনে না সংসার চলে! দিদি তার সঙ্গে মজা করছে। মৃগেন কোনো কথা বলল না।

কেতকী বলল, "বিশ্বাস হল না! আচ্ছা দেখিস।...নে ঘুমো, আমি চলি।" বিছানা ছেড়ে কেতকী উঠে পড়ল। "দরজা বন্ধ করে দে।"

কেতকী চলে যাবার পরও মৃগেন সামান্য শুয়ে থাকল; তারপর উঠল। জল খাবে। কলঘরে যাবে।

রান্নাঘরে দয়াময়ী কাজ সেরে নিচ্ছেন। শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কলঘরে যাবার সময় মৃগেনের নজরে পড়ল সদর খোলা। এগিয়ে দেখল, সদর খুলে দিদি দাঁড়িয়ে আছে।

মৃগেন কলঘরে চলে গেল। ফিরে এসে জল খেল। দয়াময়ীর কাজ শেষ হয়েছে।

নিজের ঘরে ফিরে আসছিল মৃগেন, কী মনে করে এগিয়ে সদরের দিকে গেল। দিদি একেবারে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। পায়ের শব্দে কেতকী ঘাড় ঘোরাল। "তুই? ঘুমোস নি?"

"জল খেতে উঠেছিলাম।...তুমি শোবে না?"

"মা'র হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"যাই।...শোন, বাইরে একটু দাঁড়াই। মাকে শুতে বল?"

মৃগেন কিছু বুঝতে পারছিল না। তবু বলল, "মা, তুমি শোও; আমরা একটু বাইরে দাঁড়াচ্ছি।"

কেতকী দু পা বাইরে বেরুলো। মৃগেন তার পেছনে। সারা মাঠ জুড়ে চাঁদের আলোর জোয়ার। ধবধব করছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কোনো কোনো কোয়ার্টারে বাতি জ্বলছে দু একটা। যিশুর মা গালে হাত দিয়ে বসে আছেন বাইরের চাতালে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কেতকী বলল, "কাল একটা কাজ করতে পারবি?"

"বলো।"

"পারবি তো?"

"বলো আগে।"

কেতকী সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "সেজো জেঠার দোকানে যাবি। তপুকে বলবি—"
"সেজো জেঠার দোকানে আমি যাই না।"
"তুই দোকানে না যাস, কাউকে দিয়ে তপুকে ডেকে পাঠাবি। বলবি, আমি ডেকেছি। খুব দরকার।"
"বলব।" কথাটা এত সহজ মৃগেন বোঝে নি।
কেতকী বলল, "স্টেশনে অফিসে যেন না যায়···" একটু থামল কেতকী, "বাড়িতে আসতে বলবি সন্ধেবেলায়।"
"কাল তোমার অফিস নেই ?"
"যাব না।"
"যাবে না ? ছুটি নেবে ?"
"হ্যাঁ। তপুকে বলবি, আমি বসে থাকব। নিশ্চয় করে যাতে আসে। না এলে···" কেতকী কথা শেষ করল না।
মৃগেন আচমকা বলল, "দিদি, মেজোজেঠি সেদিন হঠাৎ এসেছিল কেন ? বেড়াতে আসে নি।"
কেতকী চকিতে ভাইয়ের চোখ দেখল। বোঝা গেল না মৃগেন কিছু জেনে বা সন্দেহ করে এই প্রশ্ন করছে কি না ! কেতকী বলল, "বেড়াতেই এসেছিল। কেন ?"
"বেড়াতে আসে নি। মেজোজেঠি শুধু বেড়াতে এলে তোমরা দু জনে এ-রকম করতে না।"
ভেতরে ভেতরে কেতকী ধরা পড়ে যাবার ভয় অনুভব করল। "এ-রকম মানে ?"
"মা চুপচাপ, তুমি চুপচাপ। আজই তুমি এত কথা বললে !"
কেতকী কিছুই অস্বীকার করতে পারল না। এত স্পষ্ট, সত্য সবই যে অস্বীকার করা যায় না। নিজেকে সামলাতে সামলাতে কেতকী সাবধানে বলল, "মেজোজেঠির মাথা খারাপ। মা'র সঙ্গেই কথা বলেছে, আমার সঙ্গে আর কটা কথা হয়েছে। তুই হঠাৎ মেজজেঠির কথা তুললি কেন ?"

মৃগেন বলল, "মেজোজেঠি আমার নামে তোমাদের কাছে যা-তা বলে গেছে!"
"না," কেতকী মাথা নাড়ল।
"বলেছে। না বললে তোমরা এ-রকম করতে না।"
"না না, তোর কথা কিছু বলে নি।"
মৃগেন কথাটা কানেই তুলল না। "আমার কী দোষ। পদ্মার সঙ্গে সীতুর ভাব হলে আমার করার কী আছে!…মেজোজেঠি ভেবেছে, আমরা সীতুকে শিখিয়ে দিয়েছি, তাই সীতু মেজোজেঠির কাছে গিয়ে পদ্মাকে বিয়ে করার কথা বলেছে। আমরা শেখাই নি। আমাদের সঙ্গে সীতুর কোনো কথা হয় নি।"
কেতকী যেন পাথর হয়ে গেল। মৃগেনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল, পাতা পড়ছে না। সে এই কথাটা জানত না। তপু তাকে বলে নি। তপুও কি জানত না?
চোখমুখ গরম হয়ে উঠছিল কেতকীর। "এ-কথা তোকে কে বলেছে?"
"নীলু। সীতু নীলুকে সব বলেছে। নীলু আমাদের বলেছে।"
"তোদের মানে—?"
"আমি, শতো, জোছন ছিলাম। আমাদের কাছে বলেছে।"
কেতকীর বুক কাঁপছিল। মৃগেনের চোখ যেন বলে দিচ্ছিল সে সব জানে। নিজেকে কোনো রকমে সামলাচ্ছিল কেতকী। তার সাহস হল না জিজ্ঞেস করে আর কী বলেছে নীলু।
"পরের বাড়ির কথা নিয়ে তোমাদের এত গল্প করার কী আছে! তোমরা মেয়ে, না, ছেলে! সীতুর যা খুশি বলুক, করুক—তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার কিছু নেই।"
মৃগেন বুঝতে পারল দিদি যেন কিছু আড়াল রাখার চেষ্টা করছে। রেগেও গিয়েছে। বলল, "আমি মেজোজেঠির কাছে যাব।"
"না।"
"কেন যাব না। মেজোজেঠি নিজের দোষ দেখবে না, আমার নামে যা

খুশি বলে যাবে!"
"তুমি ও-বাড়ি যাবে না কোনোদিন। আমি বলছি যাবে না। কেতকী চিৎকার করে উঠল। "যদি যাও আমি তোমায় এ-বাড়ি ঢুকতে দেব না।"

বিছানায় স্থির হয়ে শুয়েছিল কেতকী। অনেকক্ষণ এই ভাবেই শুয়ে আছে। হাত কয়েক তফাতে মায়ের সরু খাট। দুটো বিছানার মশারির আড়াল থেকে কিছুই চোখে পড়ছে না। কোনো শব্দও নেই। মা ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে নিশ্বাস নেবার শব্দ করে ওঠে জোরে। মনে হয়, বুক ফাঁকা —বাতাস নেই বলে মা যেন প্রাণপণে অনেকটা বাতাস তাড়াতাড়ি টেনে নিচ্ছে। ঘুমের ঘোরে এই শ্বাস টানার শব্দ, আর জেগে থাকলে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ—এই দুই-ই মা'র কেমন একটা অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে।
কেতকী বুঝতে পারছিল, মা ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা দিন ঘুমোয় না, দুপুরে গা গড়ায় একটু, বাবা কবে মাকে দু চারটে বই কিনে নিজের হাতে মা'র নাম লিখে দিয়েছিল, মা এখনও ঘুরে ফিরে সেই সব বই পড়ে। বই পড়ার পর মা কপালে ছোঁয়ায়। কেতকী ব্যাপারটা দেখে আগে হাসত। মা বলেছিল, 'হাসিস কেন! ঠাকুর দেবতার বই। কপালে ছোঁয়াতে হয়।' কেতকী কিছু বলে নি। মহাভারত হয়ত ঠাকুর দেবতার, কিন্তু 'যুগলাঙ্গুরীয়' কেমন করে ঠাকুর-দেবতার বই হল?
আজ এখন কেতকী এ-সব কথা ভাবছিল না। ঠিক কী মনে হয়েছিল সে জানে না, কিন্তু ডিউটি থেকে ছুটি নিয়ে সে আজ বেণুর কাছে গিয়েছিল। গিয়েছিল কথা বলতে। মুটে মজুরও এক টানা বোঝা বইতে পারে না, কোথাও না কোথাও বোঝা নামিয়ে দু দণ্ড জিরিয়ে নেয়। কেতকীও ক্রমাগত তার মনের মধ্যে যত বোঝা চেপে উঠছিল আর যেন বইতে পারছিল না। তার ভাল লাগছিল না। নিজেকে সে খানিকটা হালকা করতে চাইছিল। কিছু পরামর্শ চাইছিল বেণুর কাছে। নিজের কোনো কোনো কথা বলতে চাইছিল।

বেণুর বাড়ি যেতে যেতে প্রায় আটটা। বেণু অবাক। তার বাড়ি স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়। রিকশায় মিনিট দশ-বারো। তবু ওই সময়ে কেতকীকে বাড়িতে দেখে বেণু ভয়ই পেয়েছিল যেন। কেতকী বলল, 'অফিস থেকে ছুটি নিয়ে পালিয়ে এলাম। তোর মুখ দেখি না অনেক-দিন।' বেণু নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে বলল, 'তাই বল। এই পোড়ার মুখ দেখতেও তোর সাধ হয়। চল, ও-ঘরে গিয়ে বসি।'

বেণুর মেয়ে গিয়েছে মামার বাড়ি; ফেরে নি তখনও। তার স্বামীও নেই। কোন কাজে বেরিয়েছে, শ্বশুরবাড়ি হয়ে মেয়ে নিয়ে ফিরবে। বাড়ি ফাঁকা। ঝি-চাকর ছাড়া কেউ নেই।

দু দশটা এলোমেলো কথা, হাসিঠাট্টা। চা নিমকি খাওয়া হল। বেণু মোরব্বা করেছিল, জোর করে খাওয়াল। খেতে খেতেই কথা উঠল। প্রথমেই সুজনের কথা। সুজন নতুন চাকরিতে যায় নি এখনও। যাবে। কোয়ার্টার পাবে সে। 'তোর কাছে আর যায় নি?' 'না।' 'তুই বড় ভুল করলি, কেতু। নিজের কপাল নিজে ভাঙলি।'

সুজনের কথা চাপা দিয়ে কেতকী মৃগেনের কথা তুলল। প্রথমে সরাসরি কিছু বলল না, পরে বলল, কেতকী এখন মৃগেনের জন্যেই ভয়ে ভাবনায় মরছে। "সারাদিন বন্ধু আর বন্ধু। শুধু আড্ডা। তুই বুঝবি না বেণু, এই বয়েসে কোনো কাজ নেই কর্ম নেই, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর বন্ধু নিয়ে মজে থাকছে—এ-বড় খারাপ। ওর বন্ধুরা সবাই ভালও নয়। আমি চাই না দিবারাত্তির বন্ধু নিয়ে থাকুক। তাতে ও উচ্ছন্নে যাবে। তুই তোর বরকে বল, যে কোনো রকম—যত ছোটই হোক—ওকে একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দিক। বসে থাকলে ওর স্বভাবচরিত্রও নষ্ট হবে।" বেণু বলল, "বলব। কিন্তু তুই হঠাৎ অস্থির হয়ে পড়লি কেন?"

অস্থির কী মৃগেনের জন্যে? ওটা ঠিক কারণ নয়; মৃগেনের কথাটা অজুহাতমাত্র। ভাই উচ্ছন্নে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে তার বন্ধুবান্ধবের জন্যে—এটা বলতে গিয়ে কেতকী সীতুর কথা তুলল। সীতুর সঙ্গে পদ্মা। তারপর একে একে সব কথা। পদ্মার অবস্থা, মেজোজেঠির বাড়ি বয়ে কাঁদুনি

গাইতে যাওয়া, মেজোজেঠি আর সেজো জেঠার মধ্যে পরামর্শ, তপুকে দিয়ে ওদের গয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা—কেতকী কিছুই বাদ দিল না। সব বলল। এমন কি মায়ের অভিমানের কথাও।

বেণু উৎকর্ণ হয়ে সব শুনল। নিজের কানকে যেন তার বিশ্বাস করতে বাধছিল। কিন্তু কোনোটাই মিথ্যে নয়। বিমূঢ় হয়ে বসে থাকল বেণু। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বেণু বলল, "আজকাল এ-সব কী হয় রে! তুই ও-বাড়ি ছেড়ে চলে এসে ভালই করেছিস।"

কেতকী বলল, "এসেও তো শান্তি নেই। গাছের ডাল যেদিকেই ছড়াক কাক চিল বসবে।"

"বসবে! তবে ক'দিন!...তুই আর কী করবি!"

"আমি কিছু করব না। কিন্তু কী ঘেন্না হয় তোকে কেমন করে বোঝাব। ...আমার সব চেয়ে রাগ হয়, ওই নচ্ছার নোঙরা ছেলেটা মৃগুর বন্ধু।"

"বন্ধু তো মৃগু কী করবে! বন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি চোর হয় তাতে তার করার কী আছে!"

কেতকী এ-সব বোঝে। মানুষের মনে বোঝা আর গায়ে লাগা তো এক জিনিস নয়। কেতকী একটু থেমে বলল, "আরও একটা কথা, ওই তপু—"

"কী তপু?"

"এমন গাধা, উজবুক আমি দেখি নি। তোর কী? কে তুই মেজোজেঠির? মেজোজেঠির মেয়ের কী হবে তার জন্যে তোর অত মাথা ব্যথা কেন! যা হবার ওদের হোক, ওরা বুঝুক।"

"বোকা বলেই..."

"বোকা বলেই সেজো জেঠা তাকে দিয়ে যা খুশি করাবে।...ও একটা কুকুর, বুঝলি বেণু, সেজো জেঠার পোষা কুকুর। তাও যদি কোনোদিন তোয়াজে রাখত। চিরটা কাল এঁটোকাঁটা ফেলে দিয়ে তু তু করে ডেকেছে, ছেঁড়া চটে শুতে দিয়েছে। তার অত লেজ নাড়া কেন?"

"কেতু, তুই কি বলতে চাস তপু এখন পালটা প্রতিশোধ নিক।"

"হ্যাঁ, নিক। পোষা কুকুরও কামড়াতে জানে। কামড়ায়।"
"কিন্তু ও-যদি না পারে? সবাই সব পারে না।"
কেতকী হঠাৎ কেমন কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে গেল। বলল, "পারে। আমি তোকে বলছি বেণু, ও পারে। অন্তত একবার সে কামড়াক। চিরটাকাল মল্লিকবাড়ির স্বার্থপর, হারামজাদা, শয়তানগুলোর সে কেন পোষা কুকুর হয়ে থাকবে। সে জন্তু, না, মানুষ!"
বেণু কেমন স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকল। তারপর বলল, "কেতু, আমি বুঝতে পেরেছি।"
কেতকীর চোখে তখন জল এসে পড়েছিল।

শতদল ঘরে ছিল না। দরজা খোলা, জিনিসপত্র যেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে সেই রকমই রয়েছে, শুধু শতদল নেই।
ঘরে নেই, কিন্তু বাড়িতে আছে এটা বোঝা যাচ্ছিল। বোধ হয় দোতলায় গিয়েছে। মৃগেন পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বসে পড়ল। ঘেমেছে খুব। রোদ যেন প্রতিদিন আরও চড়ে উঠছে এখন। একটু বেলায় বেশি ঘোরাফেরা করা যায় না।
মৃগেন আজ অনেকটাই হেঁটেছে বাড়ি থেকে স্টেশন। স্টেশনের কাছে বাজার সেরে বাড়ি, আবার সেই রিকশায় স্টেশনে ফিরে এসেছে। সঙ্গে তার সাইকেলের টায়ার-টিউব। দুটোই গিয়েছে। সারিয়েসুরিয়ে নিলে আবার ক'দিন চলতেও পারে। টায়ারে একটা তাপ্পি দরকার। টিউবের লিক সারাতে হবে।
স্টেশন থেকে হাঁটতে হাঁটতে বাজার। ভরতের কাছে টায়ার-টিউব ফেলে দিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। সেখান থেকে সোজা জেঠার দোকান। তফাত থেকে দেখল, তপুদা নেই। আসে নি তখনও, বা কোথাও গিয়েছে। অকারণ দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ফেরার সময় ঘুরে যাবে। সাইকেলের টায়ার-টিউব নিতে তাকে তো আসতেই হবে বাজারে।

কাল দোল। ফাগুয়া। আজ থেকেই বাজারপাড়া মেতে উঠেছে। রঙ সাজিয়ে বসে গেছে দোকানীরা, পিচকিরি ঝুলছে, আবির উড়ছে বাতাসে। প্রীতমের দোকানে চিনির মেঠাই সাজিয়েছে ঝুড়ি করে। কিছু বাচ্চাকাচ্চা তামাশা করে আজই রঙ ছোঁড়াছুঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছে।

মৃগেন বাজারে ঘোরাঘুরি না করে সোজা শতদলের বাড়ি চলে এল। কাল-কের ব্যাপারের পর থেকে সত্যিই তার লজ্জা করছে। বন্ধুদের সঙ্গে সে কখনও ঝগড়া করে নি। এ-বয়েসে নয়। কথা কাটাকাটি, তর্ক হয়েছে কত বার, কিন্তু সেটা সহজেই মিটে গিয়েছে, কেননা মৃগেন একনাগাড়ে অনেক-ক্ষণ চেঁচামেচি করতে পারে না।

কাল একেবারে হঠাৎ সব অন্য রকম হয়ে গেল। মৃগেন বাস্তবিকই রুক্ষ রূঢ় হয়ে পড়েছিল, মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছিল। জোছনের সঙ্গে হাতাহাতি লেগে যেতে পারত। শেষ পর্যন্ত লাগে নি যে সেটাই মঙ্গল। জোছনরা চলে আসার পর ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল মৃগেনের। দুঃখ হচ্ছিল। শতদল আর জোছন তার প্রাণের বন্ধু। ওরা মৃগেনকে কত ভালবাসে সে জানে। কেন সে বোকার মতন ঝগড়া করতে গেল ওদের সঙ্গে। ছি ছি।

"ও মা, তুমি— ?"

মৃগেন চোখ ফিরিয়ে দেখল বাঁশরী। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

বাঁশরীর দিকে তাকিয়েই মৃগেনের হঠাৎ কেমন লাগল। লজ্জা, না কি অস্বস্তি সে স্পষ্ট বুঝল না। জোছনের কথাটা মনে পড়ল। ঠাট্টা করেছে জোছন? বোধ হয় খোঁচাই মেরেছিল।

"শতো কোথায়?" মৃগেন জিজ্ঞেস করল।

"সে তো তুমিই জানো," বাঁশরী বলল, বলে ঘরে এল।

"আমি!...আমি ঘরে এসে কাউকে দেখি নি।"

"কতক্ষণ এসেছ?"

"এই তো! মিনিট দশ...।"

"দাদা তা হলে কাছেই কোথাও গিয়েছে। রজনীদারা এসেছিল। এখুনি এসে পড়বে।"

মৃগেন বুঝতে পারল, কাল সকালে দোলের বিরাট দল বেরুবে। অনেক ছেলে মেয়ে থাকবে, বাচ্চাও থাকবে এক রাশ। মৃগেনদের সময়ে দু চারজন কাকা মামারাও জুটে যেত। রজনীরা এবার কী করছে সে জানে না। আজ তিন দিন আসে নি তো জানবে কেমন করে!

বাঁশরী বলল, "তুমি নাকি ডুমুরের ফুল হয়েছ?" বলে ঠোঁট টিপে হাসল।

"মানে?"

"দাদা বলছিল। এ ক'দিন তোমাকে দেখি নি তো!"

"আসি নি এদিকে। সাইকেল খারাপ। এতটা রাস্তা হেঁটে হেঁটে আসা যায়!"

বাঁশরী ঠোঁট ওলটাল। "বাব্বা! সারাদিন তো টো টো কোম্পানি হয়ে ঘুরে বেড়াতে। এখন রাস্তার দোষ!"

মৃগেন হেসে ফেলল। দু চার মাইল রাস্তা হাঁটা তাদের কাছে সত্যিই কিছু নয়। "এখন বয়েস হয়েছে," ঠাট্টার গলায় বলল মৃগেন, "পায়ে বাত ধরছে।"

"তা তো বুঝতেই পারছি। পায়ে বাত চোখে চালসে। দাঁত পড়ছে?··· ছেলেপুলেরা ভাল আছে তো বুড়োবাবু?" বাঁশরী মাথা ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে তামাশা করে বলল।

মৃগেন যেন এক মুহূর্ত ধরতে পারে নি কথাটা, তার পর হো হো করে হেসে উঠল।

বাঁশরীও হাসছিল। হাসলে বাঁশরীর ধবধবে দাঁত দেখা যায়। সরু সরু দাঁত। ভুট্টার দানার মতন কচি, সুন্দর। হাসির সময় বাঁশরীর গলা কেমন লম্বা হয়ে যায়, মাথা হেলে যায় পেছন দিকে, চোখের পাতা বুজে আসার মতন হয়, সারাটা মুখ হাসিতে ঝকঝক করে।

বাঁশরী হাসতে হাসতে জানলার কাছে চলে গেল। ঘরে রোদ ঢুকছে। বাইরে শালিকের ডাকাডাকি। কাঠ কাটার একটু শব্দ আসছিল কোথাও থেকে।

মৃগেন বাঁশরীকে দেখছিল। কমলা রঙের শাড়ি, গায়ে সাদা জামা, পিঠে

বাসী বিনুনি। কপালে কানে উড়ো চুল।

জোছন কি মৃগেনকে ঠাট্টা করেছিল? নাকি মৃগেনের ব্যবহারে কিছু চোখে পড়েছে জোছনের। মৃগেন কোনোদিন এমন কোনো ব্যবহার করে নি যা চোখে পড়তে পারে। তা ছাড়া মৃগেন সত্যিই জানে না সে বাঁশরীকে ভালবাসে কি না। তার কোনোদিন মনে হয় নি। বাঁশরীকে তার ভাল লাগে। ঝরঝরে, সহজ মেয়ে, মজা করে, হাসিঠাট্টার কথা বলে, সরল জীবন্ত মেয়ে। বাঁশরীকে ভালবাসার কথা কেন ওঠে! সবাই তাকে পছন্দ করে, ভালবাসে।

"জোছন আসে না?" মৃগেন জিজ্ঞেস করল আচমকা।

"কেন আসবে না। রোজই আসে।"

মৃগেন বাঁশরীর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হেসে বলল, "ওর সেই বিয়ের কী হল! সেদিন তোমরা যা চটিয়ে দিলে! তারপর সারা রাস্তা আমায় তড়পালো। কী লেকচার!"

বাঁশরী বুকের ওপর বিনুনি টেনে নিয়ে খেলা করছিল। বলল, "সত্যিই জোছনদার বিয়ের জন্যে মেয়ে খোঁজা হচ্ছে।"

"খুঁজে লাভ নেই। ও যা ছেলে বিয়ে করবে না।"

"রাখ তো! করবে না সবাই মুখে বলে।"

"তার মানে তুমিও মুখে বলবে কিন্তু কাজে···" মৃগেনের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

বাঁশরী চোখ পাকিয়ে মৃগেনকে কয়েক পলক দেখল, তারপর সরু পাতলা জিভ বার করে ভেঙচাল। "অ্যা-হ্যা-হ্যা। ইয়ার্কি! হ্যাঁ, আমি কাজেও করব।"

মৃগেন হো হো করে হেসে উঠল।

বাঁশরীও ছুটে এসে মৃগেনের চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে দিয়ে পালাচ্ছিল। শতদলের গলা পাওয়া গেল বারান্দায়।

শতদল ঘরে এসে মৃগেনকে দেখতে পেয়ে দাঁড়াল। তার পর নাটকীয় ভঙ্গি করে বলল, "আরে, মৃগেনবাবু যে! কী সৌভাগ্য! তারপর বাবু, কী

মনে করে!"

বাঁশরী হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছিল, শতদল বলল, "বাঁশি মৃগেনবাবু এসেছেন—চা জল মিষ্টি দে। সেই সঙ্গে আমার সেই হাফসোল-করা জুতোটা।"

বাঁশরী পালাল।

মৃগেন হাসতে হাসতে বলল, "জুতো কেন?"

"তোকে পেটাব। কাল যা করলি! বেটা দামড়া।"

মৃগেন লজ্জা পাচ্ছিল। "না রে, আমার মন-মেজাজ ভাল ছিল না। ভুল হয়ে গেছে। সরি ব্রাদার।"

শতদল গায়ের জামাটা খুলে ফেলল। পাখার তলায় এসে দাঁড়িয়ে বলল, "কী গরম রে।"

"গিয়েছিলি কোথায়?"

"কমলদার বাড়িতে। রজনীরা এসেছিল। কমলদাকে বলে এলাম, কাল সকালে তুমি আর্মি লীড করবে। ওই ঝাঁকড়া চুল, বিশাল চেহারা, গলায় ঝুলবে মৃদঙ্গ, আর ওই দারুণ গলায়—রজনী প্রভাত হল, অলিকুল জাগিল···। সাব্বাস! কী গান! কমলদা বন্যার সুরে যা গায়। জানিস তো!"

মৃগেন হাসতে লাগল। "কাল তা হলে দল বেরুচ্ছে?"

"জরুর। রজনী রজনীরা কাজের ছেলে। বিরাট আর্মি রিক্রুট করে ফেলেছে রে। জনা তিরিশ চল্লিশ হবে। তু তিন বছর পরে কাল একটা রিয়েল হোলি হবে বেটা। দেখিস!"

"মনে হচ্ছে," মৃগেন হাসল। "জোছন আর তুই কী করবি?"

"কমলদা জাস্ট ওপেনিংটা করে দিয়ে তখনকার মতন মুখে সাইলেণ্ট হয়ে যাবে। নীলু আর সরল গাইবে। বাকি কোরাস। গণশা আর বিরিজ নাচবে। মেয়েরা হাততালি দেবে। পানু বাজাবে ঝম্প। আমরা ঘুরে ঘুরে নেচে হোলি হায় করব—" বলতে বলতে শতদল একবার ঘুরে নেচে দিল।

মৃগেন হাসিমুখে শতদলের নাচ দেখল। তার মনে পড়ছিল, এই শহরে এই পাড়ার কেমন একটা বড় দল বেরুতো আগে, দোলের দিন। বড়রা থাকত, মেয়েরা থাকত, ছোকরারা থাকত, বাচ্চা কাচ্চাও। গান হত, রঙ খেলা চলত। বড়রা একসময় কোনো বাড়িতে বসে পড়ে আড্ডা জমাত, মেয়েরা ফিরে যেত, আর ছোকরারা বিহারী মহল্লার দল নিয়ে সারা শহর মাতিয়ে বেড়াত। কারও কোনো রকম আপত্তি থাকত না, অভিযোগ উঠত না। সবাই মেতে যেত। আনন্দ করত। এক একসময় মনে হত তারা সবাই যেন এক, একই সুখে মেতে আছে। বোধ হয় মানুষের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে এক হয়ে যাবার সুযোগ এইভাবেই আসে। সুখে এবং শোকে। সে-সব দিন হুস করে হারিয়ে গেল। এখন সব আলাদা আলাদা : রাগারাগি, দলাদলি।...যাক, রজনীরা আবার সেই পুরোনো আনন্দ ফিরিয়ে আনতে পারছে।

"আমার চাঁদাটা দেওয়া হয় নি," মৃগেন বলল, "আসি নি ক'দিন।"

"আমরা দিয়ে দিয়েছি। পরে তুই দিস।"

"চার টাকা ?"

"না, তিন। রঙ কেনা হবে। একটা রিকশা ঠিক করা হয়েছে, রিকশায় রঙের বালতি, গোলাপ জল, খাবার জল থাকবে..."

"দারুণ।"

মৃগেন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। "নে।...আমি ভরতের দোকানে সাইকেলের টায়ার-টিউব সারাতে দিয়ে এসেছি। যাবার সময় নিয়ে যাব।"

"তুই বেটা বেশি পিঁয়াজী ঝাড়িস। তোর সাইকেল খারাপ—আমারটা নিয়ে গেলে পারতিস। আমি সাইকেল কতটুকু চড়ি। পড়ে আছে।"

"দিদি বলছিল একটা নতুন সাইকেল কিনে দেবে।"

"আবার ফরনাথিং টাকা খরচা। কেতুদিকে বারণ করবি।...শোন, বাবা এবার সিরিআস হয়েছে। বিশ্বাসকাকা আমার কাগজপত্র দেখেছেন। সাইটও ঠিক করে ফেলেছি গোশালার দিকে লালুবাবুর জমি আছে, লিজ

নেব। বিশ্বাসকাকা কথা বলবেন। তোকে লেগে পড়তে হবে বেটা। এন্তার ঘোরাবো তোকে। আমার সাইকেলটা তুই নিবি।"

মৃগেন খানিকটা অবাক হল। শতদলকে লক্ষ করছিল। "তুই সত্যিই ব্যবসায় নামবি?"

"আমি তোর সঙ্গে মজা করছি। করব বলেছি যখন করবোই। আই মাস্ট ডু ইট। কেন, তুই আমায় অবিশ্বাস করছিস?"

"না," মৃগেন কেমন কুণ্ঠিত গলায় বলল, "ব্যবসা করার পয়সা আমার কই?"

শতদল সিগারেট ধরাল। আড় চোখ করে দেখল মৃগেনকে। ভঙ্গিটা মজার। বিছানায় বসে বলল, "মৃগু, বয়েস হয়ে যাচ্ছে। হেলাফেলা সারা-বেলা আর নয়। বী সিরিআস! তুই আমার ম্যানেজার। কুলির মত খাটব।"

মৃগেন বলল, "বাঃ, আমি হেলাফেলা কবে করলাম!"

"তা হলে তৈরী থাকো, লেগে পড়তে হবে। তোমার শালা আমরক্ত ঝরিয়ে দেব।"

মৃগেন হাসল।

চা আর পাঁপর ভাজা এল। বাঁশরী পাঠিয়ে দিয়েছে।

পাঁপর ভাজা তুলে নিয়ে মৃগেন বলল, "জোছন আসবে না?"

"না। এ বেলায় আসবে না। আজ ওর কাজ আছে। সন্ধেবেলায় আসবে।"

ইতস্তত করল মৃগেন। "জোছন খুব রেগে গিয়েছে। তুই বিশ্বাস কর, আমি অত ভেবেচিন্তে কিছু বলি নি। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।...কাল আমার খুব খারাপ লাগছিল। রাত্তিরে ঘুমোতে পারি নি।"

শতদলও পাঁপর খাচ্ছিল। বলল, "ছেড়ে দে। যা হবার হয়ে গিয়েছে। জোছন বুঝতে পেরেছে। ও ওই রকমই।"

মৃগেন একটু অপেক্ষা করে বলল, "তোকে আর কিছু বলেছে কাল?"

"না। মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর শুধু বলল, টু মাচ হয়ে গিয়েছে, নারে? ...শালার চৈতন্য খুব।" বলে শতদল একটু থেমেই হঠাৎ বলল, "ফেরার সময় আমরা কাল কেতুদিকে দেখলাম। রিকশা চড়ে কোথাও যাচ্ছিল।"

মৃগেন অবাক। "দিদি! দিদির তো ডিউটি ছিল।"

"আমরা দেখেছি।"
"ক'টা হবে তখন ?"
"ক'টা আর, ধর সাড়ে সাত পৌনে আট···।"
মৃগেন কিছু বলল না। চায়ের কাপ তুলে নিল। দিদি কাল অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরেছে। কোথায় যাবে দিদি রিকশা চড়ে ? অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় যেতে পারে ? ও-বাড়ি ? না অন্য কোথাও ? দিদি আজকাল অনেক জিনিস লুকোয়।
শতদল বলল, "তুই আজ সন্ধেবেলায় আসছিস তো ?"
"দেখি। এখন ফেরার সময় টায়ার-টিউব নিয়ে যাব। বাড়ি গিয়ে মেরামতি করব। সাইকেল না থাকলে আসতে যেতে কত সময় লাগে, বল ?"
"আমার সাইকেলটা নিয়ে যা।"
"আমারটা আগে দেখি···"
"নিয়ে যা বেটা। তোরটা ঠিক না হলে আবার তো ডুব মারবি।"
মাথা নাড়ল মৃগেন। "না, আসব।"
দু'জনেই চুপ। পাঁপর আর চা খেতে লাগল। জানলা দিয়ে ভোমরা ঢুকেছে। শব্দ করে উড়ছিল। শতদল ভোমরাটা দেখছিল। মৃগেন জানলার দিকে তাকিয়ে। বাইরের রোদ সামান্য ম্লান হয়ে এসে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
মৃগেন বলল, "নীলু সন্ধেবেলায় আসবে ?"
"আসবে।···তুই চলে আসিস বিকেল বিকেল। সন্ধেবেলায় নেড়াপোড়া করব।"
"নেড়াপোড়া ?"
"গেঁজাব বেটা। কাল দোল। সিদ্ধি খাব। পানু প্রিপেয়ার করবে। দুধ, বাদাম, চিনি। সরবত খেয়ে শালা কৈলাসে চলে যেতে ইচ্ছে করবে।"
মৃগেন হাসল। "তোরাও হাসপাতালে যাবি।"
"বাজে বকিস না। সিদ্ধির সরবত খেয়ে কে কবে হাসপাতালে যায় ! এ চল্লু নাকি ?" শতদল ধমক দিল।

মৃগেন এল সন্ধের পর। এসে দেখল, শতদল আর জোছন চুপ করে বসে আছে। পানু, নীলু কেউ নেই।

শতদল আর জোছন এমন করে তাকাল যেন মৃগেন কোনো খবর এনেছে। মৃগেন কিছু বুঝল না। বোধ হয় লক্ষও করল না। তাকে গম্ভীর, বিরক্ত, বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

শতদল অপেক্ষ করল। শেষে বলল, "কোথা থেকে আসছিস?"

"বাড়ি থেকে," মৃগেন নিস্পৃহ গলায় বলল।

শতদল আর জোছন চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কিছু বলল না।

মৃগেন বসল একপাশে। "ওরা কোথায়?"

"আসে নি।"

মৃগেন আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। আজ যে এখানে বসে সিদ্ধি খাওয়া হবে, হই হুল্লোড় করা হবে—এ তার জানা ছিল। কিন্তু এখন তার কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

চুপচাপ। জোছন অকারণে কয়েকটা দেশলাই কাঠি জ্বালাল। তার পর শতদলের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বসে থাকবি, না, উঠবি। আর ভাল লাগছে না।"

শতদলও কেমন ক্লান্ত গলায় বলল, "উঠব। দাঁড়া, আমি একটু চোখে মুখে জল দিয়ে আসি, কেমন জ্বালা জ্বালা লাগছে।"

উঠল শতদল। "মৃগু, তুই সোজা বাড়ি থেকে আসছিস, না, বাজারের দিকেও গিয়েছিলি?"

"না, সোজা বাড়ি থেকে।"

"ও! তা হলে কিছু শুনিস নি!···বোস, আমি আসছি।" শতদল চলে গেল। মৃগেন জোছনের দিকে তাকাল। জোছন জানলার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে মৃগেন অস্বস্তি বোধ করল, "কী হয়েছে রে, কিসের শোনার কথা বলল?"

জোছন কথার জবাব দিল না।

মৃগেন অপেক্ষা করল। তারপর বলল, "তুই আমার সঙ্গে কথা বলবি না?"
জোছন মুখ ফেরাল। দেখল মৃগেনকে। "শতো বলবে।"
"কেন তুই?"
কয়েক মুহূর্ত যেন ভাবল জোছন। বলল, "আমি বললে তোর শুনতে ভাল লাগবে না।"
মৃগেন হঠাৎ কেমন চটে গেল। "আমার ভাল লাগবে না-লাগবে তুই বুঝলি কেমন করে! আমি তোকে বলেছি! আশ্চর্য! তার চেয়ে সাফ বলে দে, তুই বলবি না।"
জোছন মৃগেনের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন কিছু বোঝার চেষ্টা করল।
মৃগেন নিজেই বলল, "আমার শালা কপাল খারাপ। আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কে জানে। ফরনাথিং লোকের গালাগালি খাচ্ছি। যার যা খুশি বলে যাচ্ছে।"
জোছন বুঝতে পারল, মৃগেনের আরও কিছু হয়েছে। কী হয়েছে? জোছন বলল, "কী হয়েছে?"
মৃগেন কথা বলল না। গুম হয়ে থাকল। দিদির সঙ্গে আজ যা হয়েছে এ-রকম আর কখনো হয় নি। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে দিদি এমন অশান্তি করবে ভাবাই যায় না। মৃগেনের কিন্তু কোনো দোষ নেই। সে সকালে বাজারে এসে তপুদার খোঁজ করেছিল। সেজো জেঠার দোকানে তপুদা ছিল না। আবার যখন বেলায় ভরতের কাছে সাইকেলের টায়ার টিউব নিতে গেল—তখনও তপুদাকে দেখল না। মৃগেন সেজো জেঠার দোকানে যায় না। কখনই যাবে না। পটলাকে দেখতে পেয়ে সেজো জেঠার দোকানে পাঠাল তপুদার খোঁজ নিতে। পটলা এসে বলল, তপুদা বাইরে গিয়েছে।
বাড়ি ফিরে মৃগেন দিদিকে এই খবরটাই দিয়েছিল শুধু। দিদি সঙ্গে সঙ্গে চটে আগুন হয়ে গেল। "তার মানে? দোকানে নেই, বাইরে গিয়েছে মানে? কোথায় যাবে বাইরে? তোকে দিয়ে কি কোনো কাজ হবে না? কী আছে তোর মাথায়? শুধু নিজের আড্ডা, ইয়ার্কি, ফুর্তি! একটা লোক

দোকানে নেই, না থাকতে পারে। বাইরে গিয়েছে মানে কোনো কাজে-কর্মে কোথাও হয়ত গিয়েছে, ফিরে আসবে। তোর একটু ধৈর্য হল না দেখা করে বলে আসতে? নিজের আড্ডার বেলায় তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে!” দিদির চেঁচামেচি, চিৎকার, রাগ মৃগেন সারা জীবন সহ্য করে আসছে। হয়ত এবারও করত। কিন্তু দিদি যেভাবে চেঁচামেচি করছিল তাতে মা পর্যন্ত চটে গেল। মা কিছু বলল রাগ করেই। মৃগেনও রেগে গিয়েছিল। তারপর তিনজনে কথা কাটাকাটি, চিৎকার, চেঁচামেচিতে এমন একটা কাণ্ড করে বসল যে বাড়িটার বাতাসই পালটে গেল। মা কাঁদল। দিদি খেল না। মৃগেন চোরের মতন মুখ নিচু করে নিজের ঘরে গিয়ে বসে থাকল।

সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত। দিদির রাগেরও কোনো মানে হয় না। তুচ্ছ একটা কারণ নিয়ে এমন নোংরা ঝগড়া হতে পারে বাড়িতে মৃগেন ভাবে নি। মা আজ এমন কয়েকটা কথা বলেছে দিদিকে যা কখনো বলে নি আগে। মৃগেনও বলেছে। দিদি যদি যা মুখে আসে বলতে পারে—তবে মা আর মৃগেনের বলতে দোষ কী? সবাই তো মানুষ।

শতদল ঘরে এল। বলল, “জোছন, আমি ভাবছি পানুকে আগে ধরতে হবে।”

জোছন বলল, “কী হবে পানুকে ধরে!”

“ব্যাপারটা ঠিক ঠিক জানতে পারব।”

“পানু তো ওখানে ছিল না।”

“না থাক, সে নিশ্চয় শুনেছে সব।”

মৃগেন শতদলের দিকে তাকাল। “কী হয়েছে?”

“বিষ্টুদা সীতুকে মেরে শেষ করে দিয়েছে। নাকটাক ফাটিয়ে দিয়েছে। শুনছি একটা হাতও নাকি ভেঙে গিয়েছে সীতুর। ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে মুকুন্দরা।”

মৃগেন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। শতদলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল বোকার মতন। “[illegible] হল এ-সব?”

“এই তো সন্ধের আগে।”

"মৃগুর সামনে বলতে পারব না," স্পষ্ট গলায় নীলেন্দু বলল

"কেন ?"

জবাব দিল না নীলেন্দু।

মৃগেন হঠাৎ বলল, "আমি যাচ্ছি।" বলেই সে উঠতে গেল।

হাত ধরে ফেলল শতদল মৃগেনের। "যাবি কেন, বোস।...পরে শুনব।"

"না, আমি বসব না।...তোরা আমায় কী পেয়েছিস ? আমি সীতু ? আমি বিষ্টু ? আমার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক...!"

"কী মুশকিল ! তুই রাগ করছিস কেন ? নীলু কি বলেছে তুই বিষ্টুদা ?"

মৃগেন জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিল।

জোছন বলল, "মৃগু, তুই যাবি না। আমি তোকে ক'টা কথা বলব। তোকে শুনতে হবে। যদি তুই চলে যাস তোর সঙ্গে আমার শেষ। সেটাও বড় কথা নয়। আমি তোকে এমন কথা বলব যা তুই শুনিস নি। তোর শোনা উচিত।"

মৃগেন দাঁড়িয়ে থাকল। "কী কথা ?"

"আগে বোস।"

"না।"

"কেন ঝামেলা করছিস, বোস," জোছন বলল, "নীলু তোকে খারাপ কিছু বলে নি। তোর সামনে তোর বাড়ির কথা বললে শুনতে খারাপ লাগবে তাই বলছে না।"

মৃগেন বলল, "রেখে দে, আমার বাড়ি নেই। হল ?"

"বেশ, তোর বাড়ি নেই। বোস। আসল কথাটা শুনে যা।"

শতদল আবার হাত ধরে ফেলল মৃগেনের। "কী ছেলেমানুষি করছিস! বোস।"

বাধ্য হয়েই যেন মৃগেনকে বসতে হল।

জোছন বলল, "সীতু আজ কোথায় কখন মার খেয়েছে, কত জখম হয়েছে আমি জানি না। কিন্তু একটা কথা আমি জানি।"

তিনজনেই জোছনের মুখের দিকে তাকাল।

জোছন বলল, "কাল রাত্তিরে সীতু পদ্মাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা

করেছিল। পারে নি।"

কারও পলক পড়ল না চোখের। মৃগেন বলল, "কে বলেছে?"

"আমি বলছি।...কাল তোদের ও-বাড়িতে রাত্তিরে হুলস্থুল কাণ্ড হয়েছে। জানিস?"

"না। তুই কেমন করে জানলি?"

"বউদির কাছে শুনেছি।...দাদা কাল একটা কাজে আটকে গিয়েছিল তোদের পাড়ায়। ফিরতে রাত হয়েছিল। দাদা এসে বউদিকে বলেছে। বউদি আমায় বলল, আজ সকালে।"

নীলেন্দু বলল, "আমরাও আজ শুনলাম। হাসপাতালে।...সীতু কাল থেকেই লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল। আজ বিষ্টুদা তাকে খুঁজে খুঁজে ধরেছে।"

মৃগেন কোনো কথা বলল না।

জোছন বলল, "সীতুর হয়ে আমি ওকালতি করছি না, মৃগু। কিন্তু ওই বিষ্টুদা কোন বিবেকানন্দ! মল্লিকবাড়ির ছেলে নিজে যখন কেচ্ছা করে বেড়ায় তখন তাকে কে মারবে!..."

"কেউ না," শতদল বলল।

"না। বিষ্টুকেও মারার লোক আছে।"

"কে?"

"দেখবি কে। দেখতেই পাবি।" বলে জোছন চুপ করে গেল। আকাশের দিকে তাকাল।

মৃগেন যেন কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই জোছন বলল, "আজ ভোরের ট্রেনে তোর মেজোজেঠি মেয়েকে নিয়ে কোথায় গেল, মৃগু?"

আকাশ থেকে যেন পড়ল মৃগেন। "আমি জানি না। কে বলল, মেজো জেঠি সকালের গাড়িতে কোথাও গিয়েছে!"

"গিয়েছে। সঙ্গে তপুদা ছিল।"

মৃগেন ভীষণভাবে চমকে উঠল। অবিশ্বাসের চোখ করে তাকিয়ে থাকল জোছনের দিকে। কিন্তু বুঝতে পারছিল, অবিশ্বাসের কিছু নেই।

কেউ কোনো কথা বলছিল না।

শেষে জোছন বলল, "সীতু শালা হারামজাদা, কিন্তু সে যে অন্যায় করে ফেলেছিল তার পাশ কাটিয়ে পালাতে চায় নি। তোদের মল্লিকবাড়ি যা করল সেটা পাপ। কিসের ইজ্জত তোদের ? তোদের কী আছে ? কিছু ছিল না তোদের, কিছু থাকলে এই হাল হত না। যত শালা ফুকো কারবার।"

মৃগেন একেবারে চুপ। তার কোনো রাগ হচ্ছিল না। ক্ষোভ হচ্ছিল না। কেমন যেন ফাঁকা লাগছিল।

অনেকটা রাত হল মৃগেনের বাড়ি ফিরতে।

দুধের মতন জ্যোৎস্নায় সব যেন অসাড় হয়ে আছে। ঝিঁঝি ডাকছিল। ঝিলের দিকে জোনাকি উড়ছে।

বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন দয়াময়ী।

দেখলেন ছেলেকে। কোনো কথা বললেন না।

কেতকী বোধ হয় ঘরে ছিল।

মৃগেন দরজার কাছে গিয়ে ডাকল, "দিদি ?"

কোনো সাড়া দিল না কেতকী।

মৃগেন বলল, "তপুদা, মেজোজেঠি আর পদ্মার সঙ্গে সকালের ট্রেনে বাইরে কোথাও গিয়েছে।"

কেতকীর সাড়া পাওয়া ...া না।

"সীতু হাসপাতালে। নেশা করে যায় নি। রাঙাদা ওকে মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।"

কেতকীর এবারও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

দয়াময়ী পেছনেই ছিলেন। বললেন, "ও ঘুমিয়ে পড়েছে।"

মৃগেন বলল, "ও ! বুঝতে পারি নি।"

নিজের ঘরে এসে মৃগেন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। জানলার বাইরে যেন সকাল ফোটার মতন আলো।

মৃগেনের হঠাৎ কেমন কান্না আসছিল। এখন আর তার কিছুই ভাল লাগছিল না। ওই মাঠ, আলো; এই ঘর; মা, দিদি কাউকেই নয়। নিজেকেও।

---